Gangchil Mon by Hasan Mustafijur Rahman

For More Books Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

গাঙচিল মন

হাসান মোস্তাফিজুর রহমান

মাটির রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূর, বহুদূর। দু'ধারে সবুজ ফসলের মাঠ, আদিগন্ত বিস্তৃত। সাগরের বুকে ভেসে থাকা দ্বীপের মতো বাড়িঘর মাঝে মাঝে; ছবির মতো সুন্দর। কাঁচাসোনা মিষ্টি রোদে গা ভাসিয়ে কেমন ঝিম মেরে আছে প্রকৃতি। ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে। সে হাওয়ায় মাহিনের খোলা চুল এলোমেলো উড়ছে। উচ্ছ্বল কিশোরীর মতো অনবরত কথা বলছে ও। ওর দু'চোখ জুড়ে মুগ্ধতা। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে দু'চোখ ভরে দেখছি ওকে। আহ্‌, কি যে ভালো লাগছে! কি যে ভালো লাগছে আমার! পথচারীরা কৌতূহলী হয়ে দেখছে আমাদের। দেখছে ফসলের মাঠে কাজ করতে থাকা কিষাণ-কিষাণীরা।

'অ্যাই, 'তুই অমন ঘোড়ার মতো হাঁটছিস কেন! একটু আস্তে হাঁট না!' হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎ বিরক্ত স্বরে বললো মাহিন।

থমকে দাঁড়ালাম। উপমা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। 'কি বললি তুই!'

ফিক করে হেসে ফেললো ও। 'না... মানে বলছিলাম অতো জোরে হাঁটছিস কেন? তোর সাথে তাল মেলাতে গিয়ে পা ব্যথা হয়ে গেছে আমার।'

আহ্‌, কি সুন্দর করে হাসে এ মেয়েটা! হাসি দেখলে কলজে ছ্যাঁদা হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত এ মেয়ে যদি আমার কলজে বরাবর ছুরি চালিয়ে দিয়ে এমনি করে একটু হাসে– একটুও ব্যথা পাবো না।

স্পষ্ট টের পাচ্ছি ওর হাসি দেখে উত্তপ্ত চাঁদি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু চাঁদি ঠাণ্ডা হতে দেয়া যাবে না এ মুহূর্তে। ঝটপট আরো গরম করে ফেলতে হবে। এতো গরম, যাতে মাথায় কেটলিভর্তি পানি বসিয়ে দিলে মুহূর্তে ফুটতে শুরু করে পানি। নইলে বদ মেয়েটা আরো লাই পেয়ে যাবে। সুযোগ পেলেই ও খোঁচা দেয় আমাকে। এমন সব উপমা ব্যবহার করে যে ক'মুহূর্ত কথা সরে না মুখে। ঝট করে 49 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায় চাঁদির তাপমাত্রা। না, এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। কাভি নেহি!

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম, ‘আমি ঘোড়ার মতো হাঁটি, না? আমি ঘোড়া হলে তুই কি? তুই তো মাদি ঘোড়া!’

‘দ্যাখ!’ দু’কোমরে দু’হাত রেখে কৃত্রিম রাগে ফুঁসে উঠলো মাহিন, ‘অসভ্যের মতো কথা বলবি না! আমি মাদি ঘোড়া, না?’

‘তো কি! আমি ঘোড়া হলে তুই তো মাদি ঘোড়াই!’

‘দ্যাখ! লজ্জায় আমি কিন্তু লাল, নীল, বেগুনী হয়ে যাচ্ছি! তুই কি থামবি?’

‘না থামবো না। তুই আমাকে ঘোড়া বললি কেন?’

‘ঘোড়ার মতো হাঁটলে ঘোড়া বলবো না তো ভেড়া বলবো? সাথে যে একটা মেয়ে আছে সে খেয়াল আছে? বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও উনি ঘোড়ার মতো হেঁটেই যাচ্ছেন! ওনার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে পায়ের নাট-বল্টু খুলে গেছে আমার!’

হো হো করে হেসে ফেললাম। আশ্চর্য ভালো এ বদ মেয়েটাকে যেসব কারণে ভালো লাগে তার একটি হচ্ছে প্রবল রসবোধ। হঠাৎ হঠাৎ এমন সব কথা বলে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়।

হাসতে হাসতে বললাম, ‘তুই লেখালেখি করলে অনেক ভালো করতে পারবি।’

চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক তুলে ও বললো, ‘পাম্পিং? আমাকে পাম্প দেয়া হচ্ছে, না?’

মাহিনকে পাশে নিয়ে ফের হাঁটতে শুরু করেছি। আর কতো দূর? আর কতো দূর সে নদী? আর কতো দূর সে লঞ্চঘাট? এ রাস্তার শেষে সত্যিই সেই নদীটা আছে তো? সেই লঞ্চঘাটও আছে?

হঠাৎ দূরে দেখা যায় এক নদী! হু হু করে মাতাল হাওয়া ভেসে আসছে নদী থেকে! সাদা গাঙচিলেরা ডানায় রোদের ঝিলিক তুলে উড়ে বেড়াচ্ছে! হঠাৎই লঞ্চের ভেঁপু ভেসে আসে!

লঞ্চের ভেঁপু শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় আমার।

গাঢ় আঁধারে ডুবে আছে আমার শোবারঘর। ঘুমটা ভেঙে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালাই না। নিঃসাড় পড়ে থাকি বিছানায়। মিষ্টি স্বপ্নটার রেশ এখনো কাটেনি; এখনো যেন লঞ্চের ভেঁপু কানে ভেসে আসছে। এ নিয়ে কতোবার দেখলাম স্বপ্নটা? হিসেব নেই। মাঝে মাঝেই দেখি। এভাবে অসংখ্যবার দেখেছি। প্রতিবার হুবহু একই স্বপ্ন দেখি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। প্রতিবারই লঞ্চের ভেঁপু শোনামাত্র ঘুম ভেঙে যায়। আমার মতো এভাবে কেউ হুবহু এক স্বপ্ন এতোবার দেখেছে কিনা জানা নেই। আমার এ স্বপ্ন দেখার কথা কেউ জানে না। শুধু মাহিন জানে।

কিসের যেন শব্দ হচ্ছে বাইরে। শুয়ে শুয়েই কান পাতি। বোঝার চেষ্টা করি কিসের শব্দ। হঠাৎই বুঝতে পারি ওটা বৃষ্টির শব্দ। বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আমার দেহ-মন। বৃষ্টি কি যে ভালো লাগে আমার! আমার সবচেয়ে প্রিয়। না, ভুল বললাম। মাহিন আমার সবচেয়ে প্রিয়। তারপর বৃষ্টি।

বাতি না জ্বেলেই লাফিয়ে বিছানা ছাড়ি। দ্রুত চলে যাই জানালার কাছে। দু’হাতে পর্দা সরিয়ে দিয়ে জানালা খুলে দিই। মুহূর্তে কানে ভেসে আসে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ। ভেজা, ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাপটা মারে মুখে। আহ্, বৃষ্টি! রিমঝিম বৃষ্টি! কি যে ভালো লাগছে আমার!

রাস্তার ওপাশের লাইট পোস্টটায় আলো জ্বলছে। বৃষ্টির ফোঁটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওখানটায়। হাওয়ার তোড়ে মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে পড়ছে বৃষ্টি। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি। ঘুম ঘুম ভাবটা অনেক আগেই উধাও হয়ে গেছে দু’চোখ থেকে। এখন আমার দু’চোখ জুড়ে কেবলই মুগ্ধতা। রাত ক’টা এখন? জানি না। বাতি জ্বেলে দেখতে ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা, মাহিনও কি ওর জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে? নাকি ঘুমুচ্ছে? উহুঁ,

মনে হয় না। ঘুমিয়ে থাকলেও এতোক্ষণে নিশ্চয়ই জেগে গেছে। বৃষ্টি হবে অথচ ও টের পাবে না– এটা অসম্ভব। বৃষ্টি যা পছন্দ করে ও! আমার ধারণা, ও ঘুমিয়ে থাকলেও বৃষ্টির ঘ্রাণ ওর নাক দিয়ে ঢুকে জাগিয়ে দেয় ওকে!

এ মুহূর্তে খুব ইচ্ছে করছে ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে। দু'জনেই বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ শুনতে শুনতে কথা বলা। দারুণ রোমান্টিক একটা ব্যাপার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ফোনটা ওর ঘরে না, ওর আব্বু-আম্মুর ঘরে। অতএব, প্রিয় এ মুহূর্তে প্রিয় মানুষের সঙ্গে কথা বলার কোনো উপায় নেই।

তবে বৃষ্টির সময় প্রায়ই কথা হয় ওর সঙ্গে। দিনে। রাতে। কিন্তু কখনোই এতো রাতে হয়নি। ক'দিন আগে এক রাতে বৃষ্টির সময় ফোনে কথা হচ্ছিলো ওর সঙ্গে। হঠাৎ অদ্ভুত একটা কথা জানালো ও। শুনে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিলো না। এ কথাটা জানার জন্য কতোদিন যে ওকে অনুরোধ করেছি! ফাজিলটা বলতো না। শুধু হাসতো। সেদিন রাতে কেন যেন হঠাৎ করে বলে ফেললো।

ধাঁধার শুরু বেশ অনেক দিন আগে। ফোনে কথা হচ্ছিলো সেদিন। হঠাৎ ও বললো, 'তুই আমাকে আগে প্রায়ই অদ্ভুত একটা কথা বলতি। শুনে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যেতো আমার। অনেকদিন ধরে ওই কথাটা আর বলিস না।'

'কোন কথাটা?'

'বলবো না।'

'প্লিজ!'

'না আমি বলবো না।'

'কথা শুনে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যেতো! আশ্চর্য তো! কতোদিন ধরে ওই কথাটা আর বলি না?'

'অনেক দিন ধরে।'

'আগে প্রায়ই বলতাম?'

'হ্যাঁ।'

'ধুত্তোর বুঝতে পারছি না! বল না!'

হাসিতে ভেঙে পড়ে ও বলেছে, 'তা আমি তোকে বলবো কেন?'

এরপর আরো অনেকবার ফোনে ও আমাকে বলেছে, 'কতোদিন ধরে ওই অদ্ভুত কথাটা তুই আমাকে বলিস না!'

'কোন কথাটা? জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে?'

'না।'

'আই নিড আ ওয়ার্ম হাগ?'

'না।'

'ঘোড়ার ডিম?'

'হ্যাঁ!' বলে খিলখিল হেসে ফেলেছে বদ মেয়েটা।

শেষে সেদিন রাতে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। মোবাইল থেকে ওদের ফোনে মিসকল দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। একটু পরই

ফোন করলো ও। রিসিভ করেই অন্যান্য বৃষ্টির দিন কথার শুরুতে যা বলি তা বললাম, 'ইট'স রেইনিং, হানি!'

'এ কথাটাই।'

'মানে?'

'তোর এ কথাটা শুনেই গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যেতো। কতোদিন পর বললি!'

'কি বলছিস!'

'হ্যাঁ।'

'এ কথাটা শুনে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যেতো তোর!'

হাসতে হাসতে ও বললো, 'হ্যাঁ।'

'আজ দাঁড়ায়নি?'

'হ্যাঁ!'

আচ্ছা, একটা মিস কল পাঠালে কেমন হয়? জেগে থাকলে অবশ্যই শুনতে পাবে ও। বুঝবে বৃষ্টির এ রাতে স্মরণ করছি ওকে। সুযোগ পেলে ও মিস কল পাঠাতে পারে।

মোবাইলটা বালিশের পাশে রাখা। নিয়ে এসে ফের জানালার পাশে দাঁড়ালাম। তারপর বৃষ্টি দেখতে দেখতে একটা মিস কল পাঠালাম ওদের ফোনে।

মিনিটদশেক পর আমাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ বেজে উঠলো আমার মোবাইল। একটা রিং হয়েই থেমে গেলো। মিস কল। মাহিনদের নম্বর। তার মানে সত্যি সত্যি ও জেগে! কিভাবে মিস কল পাঠালো! নিশ্চয়ই অন্ধকারে পা টিপে টিপে ওর আব্বু-আম্মুর ঘরে ঢুকেছিলো। কি সাহস!

তার মানে আমার মতো ও -ও বৃষ্টিভেজা নিঃসঙ্গ এ রাতে মনে করছে আমাকে! এখন কেন যেন মনে হচ্ছে, এ মেয়ে পারবে। স্বপ্নের সেই নদী তীরে, স্বপ্নের সেই লঞ্চঘাটে নিয়ে যেতে পারবে আমাকে।

'আমি জানি। তোর সব স্বপ্নের ঠিকানা আমার জানা।'

হ্যাঁ, আমার মন বলছে, এ মেয়ে ঠিকই একদিন সেখানে নিয়ে যাবে আমাকে।

দুই

হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেলো। কেন ঘুম ভাঙলো বুঝতে পারলাম না প্রথমটায়; পর মুহূর্তে চোখে-মুখে পানির ছাঁট লাগতেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বৃষ্টি হচ্ছে আর আমি শুয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছি!

আমার খাটটা জানালার লাগোয়া। জানালাটা উত্তর দিকে। অর্থাৎ উত্তর দিকে মাথা রেখে ঘুমুই আমি। দ্রুত বেড সুইচ টিপে বাতি জ্বালালাম। উত্তুরে বাতাস ঢুকছে জানালা দিয়ে। পর্দাগুলো পতপত করে উড়ছে পতাকার মতো। দু'হাতে পর্দা সরিয়ে দিলাম দু'পাশে। সরিয়ে দিতেই বৃষ্টির রেণু হাওয়ায় ভেসে এসে সোহাগী পরশ বুলিয়ে দিলো আমার চোখে-মুখে। ভীষণ ভালো লাগায় চোখ বুজে ফেললাম।

রিমঝিমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। বিছানায় বসে বৃষ্টি দেখছি। ইস্, কি যে ভালো লাগছে আমার! এ মুহূর্তে হাসিল পাশে থাকলে ভালো লাগাটা কোটি গুণ বেড়ে যেতো। আচ্ছা, ও কি করছে এখন? নিশ্চয়ই নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। কি চমৎকার বৃষ্টি হচ্ছে আর উনি ঘুমুচ্ছেন। গাধা আর কাকে বলে!

আমার বৃষ্টিপ্রীতি দেখে একদিন অদ্ভুত এক প্রশ্ন করে বসেছিলো ও। প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। ভীষণ অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম ওর দিকে। সেদিন ওয়াটার ফ্রন্ট বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা। হাঁটতে হাঁটতে অনেক ভেতরে চলে গিয়েছিলাম। আকাশ আগ থেকেই মেঘলা ছিলো। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো। দৌড়ে ঝাকড়া, বড়ো একটা গাছের নিচে আশ্রয় নিলাম আমরা। বৃষ্টির ঝাপটা আসছিলো। কি যে ভালো লাগছিলো! মুগ্ধ হয়ে বৃষ্টি দেখছিলাম। আমার পাশে যে একটা প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে মনেই ছিলো না! ঠিক এ সময়েই আচমকা প্রশ্নটা করেছিলো ও।

‘আচ্ছা, একটা কথা সত্যি করে বলবি?’

‘না, মিথ্যে করে বলবো।’

‘ফাজলামো করিস না। আমি সিরিয়াস।’

‘নাটক না করে বলে ফেল।’

‘তুই কি বৃষ্টি বেশি ভালোবাসিস, নাকি আমাকে?’

কথা বলতে বলতে বৃষ্টি দেখছিলাম আমি। অদ্ভুত প্রশ্নটা শুনে চমকে ঝট করে ওর দিকে তাকালাম। ‘মাথার তার সবগুলোই মনে হয় ছিঁড়ে গেছে?’

‘তোকে আগেই বলেছি আমি সিরিয়াস’, গম্ভীর কণ্ঠে বললো ও।

‘আমিও সিরিয়াস। বাজি ধরে বলতে পারি তোর মাথার সবগুলো তারই ছেঁড়া।’

‘ফাজলামো রাখ। আমি একটা প্রশ্ন করেছি।’

‘অচিরেই তোকে পাবনা পাগলাগারদে ভর্তি করাতে হবে রে!’

‘মাহিন, আমি কিন্তু এবার রাগ করবো!’ ‘বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সোজা বাসার দিকে হাঁটা ধরবো।’

খিলখিল হেসে ফেলে বললাম, ‘সেটা তুই পারবি না। বৃষ্টিতে ভিজে এলাকায় ঢুকলে তোর তো আবার প্রেস্টিজ যাবে!’

‘পেত্নীর মতো হাসবি না!’

‘আমার হাসি সম্পর্কে আমি সচেতন, বৎস! এই পেত্নীমার্কা হাসি দেখেই কতোজন কাৎ হয়ে গেলো!’

‘যারা কাৎ হয়ে যায় তাদের সামনে গিয়ে ভেটকি মারগে যা! আমার সামনে মারবি না। দেখলে গা জ্বলে যায়।’

‘আসলেই তোর সবকিছু মেয়েদের মতো!’

‘মানে!’

‘এই যে মেয়েদের মতো কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ঝগড়া করছিস?’ ইচ্ছে করেই খোঁচা দিলাম গাধাটাকে।

‘কি! আমি ঝগড়া করছি!’

‘না আপনি বড়োই রোমান্টিক কথাবার্তা বলিতেছেন।’

‘দেখ ছেমড়ি, আমি তোকে একটা প্রশ্ন করেছি। প্রশ্নটার জবাব দিলে কথা এতো বাড়তো না।’

‘ওই ছেমড়া, এটা একটা প্রশ্ন হলো! এমন বেকুবের মতো প্রশ্ন কেউ করে? রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে এখনো।’

'মাহিন, আমি সিরিয়াসলি জবাবটা শুনতে চাচ্ছি!'

এবার সত্যি সত্যি সিরিয়াস হয়ে গেলাম আমি। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠলো কেন যেন। 'এতোদিন পর... হাসিন এতোদিন পর জানতে চাচ্ছিস কাকে বেশি ভালোবাসি আমি! তাও প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়েছিস সামান্য এই বৃষ্টিকে! তোর একটুও লজ্জা করলো না!' বলতে বলতে কি এক অভিমানে কেঁদে ফেলেছিলাম। ছাগলটা প্রথমে হতভম্ব। তারপর আমার চোখের পানি মুছিয়ে দিতে দিতে সে কি অনুতাপ!

নাহ্, এখান থেকে বৃষ্টি দেখে যুৎ পাচ্ছি না। বারান্দায় চলে যাওয়া দরকার। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেক মজা করে দেখা যাবে বৃষ্টি। হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাবে। মাঝে মাঝে ঝাপ্টাও নিশ্চয়ই আসবে। ঝাপ্টা না খেয়ে বৃষ্টি দেখায় সুখ নেই।

খাট থেকে নেমে এগোলাম। জানালার মতো আমার বারান্দাটাও উত্তর দিকে। বারান্দাটা ছোট্ট গ্রিল দিয়ে ঘেরা। আমার নিজস্ব একটা ভুবন। সময় সুযোগ পেলেই ওখানে গিয়ে দাঁড়াই আমি। বিশেষ করে রাতে। বাসার সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশাল ওই আকাশটাকে দেখি। রাতের আকাশ কি যে সুন্দর!

দরোজার ছিটকিনি খুলে বারান্দায় চলে এলাম। আহ্, কি দারুণ বৃষ্টি পড়ছে! বারান্দার উল্টোদিকে খালি একটা প্লট। প্লটটা আম্মুর নামে লিখে দিয়েছে আব্বু। আম, কাঁঠাল, কলাসহ অসংখ্য গাছ লাগিয়েছে আম্মু ওখানে। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ফোঁটা ওসব গাছের পাতায় পড়ে অদ্ভুত ছন্দময় একটা শব্দ হচ্ছে।

গ্রিলের ফাঁক গলিয়ে হাত বাড়িয়ে রেখেছি। বৃষ্টির ঠাণ্ডা ফোঁটা পড়ছে হাতে। কি যে ভালো লাগছে আমার! খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে।

দমকা বাতাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাকে। মুহূর্তে শিহরণ খেলে যাচ্ছে পুরো শরীরে। অসম্ভব, অসম্ভব এবং অসম্ভব ভালো লাগছে আমার। পারলে আম্মু এখন ঠেকাক। আম্মুর জন্য বৃষ্টিতে একটু ভিজতেও পারি না। বৃষ্টি আসার আগ দিয়ে আমার চঞ্চলতা দেখেই মহিলা টের পেয়ে যায় তার কন্যার বৃষ্টিতে ভেজার খায়েশ হয়েছে। বারান্দার গ্রিলের পাশে দাঁড়িয়ে ভিজবে বা অলক্ষ্যে ছাদে উঠে যাবে। ব্যাস, কন্যাকে পাহারা দিতে শুরু করেন জননী। এতো শাসন ভালো লাগে না। আমি এখন যথেষ্ট বড়ো। অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। নিজের ভালো-মন্দ কম বুঝি না। আম্মুর এটা বোঝা উচিত। তাছাড়া আর ক'দিন পর তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবো। তখন তো মন চাইলেও বৃষ্টিতে ভিজতে পারবো না। পুত্রবধূকে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখলে পাড়া-প্রতিবেশী তো বটেই, শ্বশুর শাশুড়ীও ছ্যা ছ্যা করে উঠবে। অথচ তাদের বিবাহযোগ্যা কন্যারা বৃষ্টির মধ্যে ধেই ধেই করে নাচলেও কোনো সমস্যা নেই। যতো সমস্যা পুত্রবধূর বেলায়। কি বিচিত্র আমাদের মন-মানসিকতা!

বৃষ্টির বেগ আরো বেড়েছে। সেই সঙ্গে দমকা হাওয়া। ঝাপটা খেতে খেতে প্রায় গোসল হয়ে গেছে আমার। ইস্, আম্মু যদি এখন আমাকে দেখতো! আচ্ছা, বেজিগুলোর এখন কি খুব কষ্ট হচ্ছে? বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডায় কাঁপছে? আহারে বেচারারা! বড়ো বড়ো ঘাস আর আগাছাও জন্মেছে আম্মুর বাগানে। ইয়া বড়ো বড়ো বেজি আছে ওখানে। দেখলে ভীষণ ভয় লাগে আমার। অথচ আম্মুটার কাণ্ড দেখো! প্রায়ই ওগুলোকে খাবার দেয়। বাসি ভাত, তরকারি, মাছের আঁশ ইত্যাদি ছুঁড়ে দেবার পর গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে ওগুলো। মজা করে খায়। দোতলার আমার এ বারান্দা থেকে অনেকদিন এ দৃশ্য দেখেছি। আর বেজি পালে দেখে আম্মুর নাম দিয়েছি বেজিওয়ালী। প্রথমদিন উপাধি শুনে খুন্তি হাতে তেড়ে এসেছিলো আম্মু।

ইস্, হাসিনটা এখন পাশে থাকলে কি যে মজা হতো! দু'জনে মিলে একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজা যেতো। কি সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে! গাধুটা নিশ্চয়ই এখনো ঘুমুচ্ছে। বৃষ্টির শব্দে যে জেগে উঠে বৃষ্টি দেখবে– সে বান্দাই নয় ও।

'গতকাল রাতে বৃষ্টি টের পেয়েছিলি?' অসংখ্য দিন জিজ্ঞেস করেছি ওকে।

শুনে প্রতিবারই ক্যাবলার মতো মুখ করে বলেছে, ‘বৃষ্টি হয়েছিলো? কখন? কই, টের পাইনি তো!’

শুনে এমন রাগ লাগে! জিনিস একখান! কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমায়। নইলে বৃষ্টির শব্দে ঘুম আবার না ভাঙে কি করে!

হঠাৎ আমাকে আপাদমস্তক চমকে দিয়ে আমাদের টেলিফোনটায় একটা রিং বেজে উঠলো।

তিন

কিছুটা মন খারাপ ছিলো সেদিন। কতোদিন ধরে দেখা হয় না মাহিনের সঙ্গে! সেদিন হাসতে হাসতে ফোনে ও বলেছিলো, ‘সবসময় মনে রাখবি তুই আর আমি মাত্র দশটাকা রিকশাভাড়া দূরত্বে বাস করি। তোর আর আমার মাঝে ব্যবধান মাত্র দশটাকা!’

সেই মাত্র দশটাকার ব্যবধানকে এ মুহূর্তে দশহাজার টাকার ব্যবধান মনে হচ্ছে। তিরিক্ষি হয়ে আছে মেজাজ। রিকশা পাচ্ছি না। যাও দুয়েকটা পেয়েছি, মাহিনদের পাড়ায় যেতে রাজি হয়নি কেউ। পাড়ার নাম শুনে উদাস ভঙ্গিতে প্যাডেল মেরে চলে গেছে। মাথা নেড়ে মানা করা বা মুখে না বলারও প্রয়োজন বোধ করেনি শালারা। একটু আগে অবশ্য একজন রাজি হয়েছিলো। ভাড়া চাইলো বারো টাকা। অথচ ভাড়া চাওয়া উচিত ছিলো আট টাকা। দশটাকা দূরত্বে থাকি আমরা। কিন্তু এর মধ্যে দু’টাকার পথ হেঁটে ফেলেছি। অতএব আটটাকা চাওয়া উচিত ছিলো ব্যাটার। তা না করে উল্টো চারটাকা বেশি চেয়েছে। ফলে রাজি হইনি। এখন মনে হচ্ছে রাজি না হওয়া গাধামি হয়ে গেছে। পুরো দশটাকার পথই সম্ভবত হেঁটে পার করতে হবে। হাঁটার জন্য আমার পা দুটোর বেশ সুখ্যাতি রয়েছে। কিন্তু এ মুহূর্তে খুব ক্লান্ত আমি। পা দুটো কন্ট্রোলে নেই। সোজা ফেলতে গেলে ডানে বা বাঁয়ে সরে গিয়ে ল্যান্ড করছে।

গতকাল গভীর রাতে মাহিনের মিস কল পাওয়ার পর খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো ওর সঙ্গে। জানালার পাশে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রাতের বৃষ্টি দেখছিলাম আর ওর কথা ভাবছিলাম। ও এখন পাশে থাকলে কি ভালোই না লাগতো! পেছন থেকে ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বৃষ্টি দেখা যেতো। ঠিক আছে, একসঙ্গে বৃষ্টি দেখা না হোক, ফোনে তো কথা বলা যায়। খুব ইচ্ছে করছিলো ফোনে ওর সঙ্গে কথা বলতে। আশায় ছিলাম ওর ফোনের। যদিও জানতাম ব্যাপারটা ওর জন্য হিমালয়ের চূড়ায় ওঠার চেয়েও কঠিন। আব্বু-আম্মুর ঘরে অন্ধকারে পা টিপে টিপে ঢুকে আমার মিসকলের জবাব দিয়েছে এই তো বেশি।

অনেকক্ষণ একা একা বৃষ্টি দেখে শুয়ে পড়েছিলাম শেষে। কিন্তু ঘুম আসছিলো না কিছুতেই। খুব মনে পড়ছিলো ওর কথা; খানিক আগে স্বপ্নে দেখা স্বপ্নের সেই লঞ্চঘাটের কথা।

ঘুমটা এসেছিলো সকালের দিকে। বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। কাজ করি একটা দৈনিক পত্রিকায়। দুপুর থেকে অফিস। সকালে অ্যালার্মের শব্দে ঘুম থেকে উঠে অফিস দৌড়ানোর তাড়া নেই। তাড়া থাকলে রাতে বৃষ্টি বিলাস আর অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুম বিলাস পেছন দিয়ে বেরুতো। সে যা হোক, বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মাহিনের কথা মনে পড়ে গেলো। মনে পড়ে গেলো সেই লঞ্চঘাটের কথা। প্রচণ্ড কাছে পেতে ইচ্ছে করলো ওকে। ইচ্ছে করলো কথা বলতে। বালিশের পাশ থেকে মোবাইল নিয়ে মিসকল পাঠালাম। এছাড়া উপায় নেই। সরাসরি ফোন করে ওকে পাওয়া যায়ই না বলতে গেলে। অন্য কেউ ধরে। লাইন কেটে দিতে হয়। মোবাইল থেকে ডিজিটাল। অহেতুক বাড়তি বিল ওঠে। তাছাড়া ঘন ঘন এভাবে লাইন কাটলেও সমস্যা। সন্দেহ করবে। তাই এই মিসকল টেকনিক। সময় সুযোগমতো ফোন করে ও।

আধঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও কোনো খবর নেই মেয়েটার। আজ তো বাসায়ই আছে। কলেজ বন্ধ। তাহলে? বাপজান কর্ডলেস হাতে নিয়ে বসে আছে? নাকি কোথাও গেছে ও? কি জানি! খুব ছটফট লাগছিলো। শেষে সরাসরি ফোন করে বসলাম। বাজখাই কণ্ঠের হ্যালো শুনে মেজাজ খারাপ করে লাইন কেটে দিলাম।

আমার হবু শ্বশুর আব্বাজান।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে অফিসে চলে গেলাম। কিন্তু মন বসছিলো না কাজে। বারবার বদ মেয়েটার কথা মনে পড়ছিলো। অফিস থেকেও দু'বার মিসকল পাঠিয়েছি। পাত্তা নেই। কি এমন সমস্যা যে একটা মিসকলও পাঠাতে পারে না! মোবাইলের ডিসপ্লেতে প্রিয় নাম্বারটা দেখলেও তো একটু শান্তি লাগে!

অফিস থেকে মন খারাপ করে বাসায় ফিরেছি সন্ধ্যার দিকে। একটুও বিশ্রাম নিইনি, নাশতাও করিনি। কাপড় পাল্টে সোজা বেরিয়ে পড়েছি মাহিনদের মহল্লার উদ্দেশ্যে। মন যখন প্রচণ্ড উচাটন হয়, ওকে এক পলক দেখার জন্য এভাবে রাতে ছুটে যাই। ওদের মহল্লায় পৌঁছে ফোন করি বা আগেই ফোনে কথা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ও। নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। হাতে থাকে সিগারেট। যাতে কেউ কিছু সন্দেহ না করে। সিগারেট টানতে টানতে ওকে দেখি। আলো-আঁধারীতে ডুবে থাকা বারান্দায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ও- ও আমাকে দেখে। কোনো কথা নেই, শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দু'চোখ ভরে পরস্পরকে দেখা। বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। চলে আসতে বাধ্য হই। ওর আব্বুকে এলাকার সবাই চেনে। আমাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেউ কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে। তাছাড়া ওর ভাইয়া অনেক সময় ওই রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে। অতএব প্রতিবারই পেছনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেখে একটু পরই চলে আসতে হয় আমাকে।

ফোনে বেশ কয়েকদিন মাহিন মন কেমন করা কণ্ঠে বলেছে, 'তুই এভাবে আসিস না।'

কেন যাবো না জিজ্ঞেস করেছি প্রতিবারই। একবারও উত্তর দেয়নি ও। এড়িয়ে গেছে। এড়িয়ে গেলেও উত্তর আমার জানা। আমি বুঝি। আমার মতো ওরও কষ্ট হয়। কষ্ট হলেও আমার কিছু করার নেই। যেতেই হয় আমাকে। না গিয়ে আমি যে পারি না! আজো যাচ্ছি। ওর কষ্টটাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসবো।

কিন্তু যাবো যে শালার রিকশাই তো পাচ্ছি না! চারভাগের একভাগ পথ হেঁটে পার করে দেবার পর একটা পাওয়া গেলো। কিন্তু ভাড়া বারোটাকা! কেবল বাংলাদেশেই এটা সম্ভব! লাফিয়ে উঠে পড়লাম। বাইশটাকা দাবি করলেও রাজি হয়ে যেতাম। এটুকু পথ হেঁটেই পা ব্যথা হয়ে গেছে।

রিকশাঅলা বুড়ো মানুষ। তার চেয়েও বুড়ো তার রিকশা। খুব ধীরে চলছে। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। চাচামিয়ার চালানোর ভঙ্গিটাও দেখার মতো। এমন ভঙ্গিতে চালাচ্ছে যেন সাঁতার শিখছে। সর্বনাশ, এ গতিতে চললে তো মাঝরাত হয়ে যাবে পৌঁছুতে!

'চাচামিয়া, আরেকটু জোরে চালানো যায় না?'

'এইডা তো বেবি টেশকি না যে আরো জোরে চলবো। চুপচাপ বইসা থাকেন। না পোষাইলে নাইমা যান। ভাড়া লাগবো না!'

ধাঁ করে মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। বলে কি লোকটা! দাঁতে দাঁত চেপে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম। চাচামিয়া কঠিন চিজ। কিছু বললে হয়তো রাস্তার পাশে ব্রেক চেপে বলবে, 'নামেন! একশো ট্যাকা দিলেও যামু না। আপনের মতো নবাব পিসিঞ্জার আমার দরকার নাই।'

রিকশাঅলারা একবার বেঁকে বসলে এদের আর সোজা করার উপায় নেই। তাছাড়া ক্যাচাল শুরু হওয়ামাত্র স্পটে ভোজবাজির মতো উদয় হয়ে যাবে আরো কয়েকটা রিকশা। আমার রিকশাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে ওই রিকশাগুলো। রিকশাঅলারা কিছু না শুনেই চাচামিয়ার পক্ষ নেবে। তখন নেমে পড়া ছাড়া উপায় থাকবে না। এসব ভেবে ব্যাপারটা হজম করে ফেললাম। বদহজম হলেও আমারই বিপদ হবে।

প্রজেক্ট এলাকায় থাকে মাহিনরা। যে রাস্তাটা দিয়ে প্রজেক্টে ঢুকতে হয় তার গোড়ায় ছেড়ে দিলাম রিকশা। রাস্তাটার ল্যাম্প পোস্টগুলোর বেশিরভাগ বাতিই ফিউজ। আলো-আঁধারী পরিবেশ। হাঁটতে শুরু করে পকেট থেকে মোবাইল বের করে একটা মিসকল পাঠালাম। মাহিন এখন ফোন করলেই হয়। মিসকল না পাঠিয়ে সরাসরি ফোন করলে ধরা খাওয়ার আশংকা রয়েছে। ওদের বাড়িটা প্রথম দিকেই, এ রাস্তাটার পাশে। পাশ

দিয়ে যাওয়ার সময় আড়চোখে ওর বারান্দার দিকে তাকালাম। বাতি নেভানো বারান্দার। বারান্দায় আসার দরোজাটা বন্ধ। জানালাগুলোও। তবে আলো জ্বলছে ওর কামরায়। ও কি ভেতরেই আছে? রিংটা শুনতে পেয়েছে তো?

লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে রাস্তায়। খামোকা দাঁড়িয়ে থাকলে সন্দেহ করা স্বাভাবিক। তাছাড়া ওর ভাইয়া বা তার বন্ধুরাও থাকতে পারে আশপাশে। আমাকে লক্ষ্য করলে কেইস ধরতে সময় লাগবে না। তাই না থেমে টং দোকানটার দিকে এগিয়ে গেলাম। পাঁচটা সিগারেট কিনে একটা ধরিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তার পাশে নির্দিষ্ট জায়গাটায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় বারান্দাটা। সিগারেট টানতে টানতে আড়চোখে তাকাচ্ছি। এ সময় ও বারান্দায় এলে আলো-আঁধারীতেও চিনে ফেলতো আমাকে।

সিগারেট প্রায় শেষ। এখনো রিং ব্যাক করেনি মাহিন। তাহলে কি মিসকল শুনতে পায়নি? এখানে এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। রাস্তায় বেশ লোকজন। এদের মধ্যে ওর ভাইয়া থাকা বিচিত্র না।

শেষ টান দিয়ে ফেলে দিলাম সিগারেট। বারান্দার দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলাম টং দোকানটার দিকে। হাতের বাঁয়ে মসজিদ ফেলে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার শেষ মাথায় চলে এলাম। উল্টো দিকে বিল। উত্তর দিকে প্রজেক্টের শেষ মাথা এটা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ওদের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে মেজাজ। এতো দূর থেকে এসে ওকে একটু না দেখেই চলে যেতে হবে? আরেকটা মিস কল পাঠাবো? এতেও সমস্যা। বাসার সবার মনোযোগ টেলিফোনের দিকে চলে যাবে। গেলে যাক। কিচ্ছু করার নেই। পকেট থেকে মোবাইল বের করে আরেকটা মিসকল পাঠিয়ে দিলাম।

নির্দিষ্ট জায়গাটায় এসে বারান্দার দিকে তাকালাম। কেউ নেই। না থাকুক, কোনো সমস্যা নেই। কল ব্যাক করলেই মিনিটের মধ্যে বারান্দায় হাজির করানো যাবে ওকে। লোকজনের নজর এড়ানোর জন্য আরেকটা সিগারেট ধরালাম। মাঝে মাঝেই আড়চোখে তাকাচ্ছি বারান্দার দিকে। কান খাড়া হয়ে আছে মোবাইলে রিং শোনার জন্য।

সিগারেট শেষ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কি! দ্বিতীয় মিসকলও কি শোনেনি ও? না শুনলেও এমনিতেও কি একটা ফোন করতে পারে না? প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তো প্রায়ই করে। গোটা একটা দিন যোগাযোগ নেই। একবার ফোন করা কি উচিত ছিলো না ওর? গতকাল রাতে মিসকল দিয়েই সব দায়িত্ব শেষ করে ফেলেছে! যত্তোসব!

না, এখানে আর এভাবে ঘোরাঘুরি করা ঠিক না। এক্ষুণি চলে যাবো। তবে যাওয়ার আগে শেষ চেষ্টা। এবার সরাসরি। যার খুশি সে ফোন রিসিভ করুক। কচুটাও যায়-আসে না আমার।

রিং হচ্ছে। এক রিং...দুই রিং... আল্লাহ্ ও যেন ধরে... তিন রিং। চতুর্থ রিঙে রিসিভার তোলার শব্দ পেলাম। নিজের অজান্তেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছি। এই বুঝি ওর কিন্নরী কণ্ঠ শুনতে পাবো!

'হ্যালো!' কিন্নরী কণ্ঠের বদলে বাজখাঁই কণ্ঠ শুনলাম। হবু শ্বশুর আব্বাজান।

ফোর ফোরটি ভোল্টের শক খেয়ে লাইন কেটে দিলাম। অভিশপ্ত বারান্দাটার দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। হ্যাঁ, একেই বলে দশটাকা দূরত্বে বসবাস!

চার

'আমি কি তোমার ছাতার নিচে একটু দাঁড়াতে পারি?'

'শিওর।'

'থ্যাংক য়্যু।' 'কোন ইয়ারে তুমি?'

‘সেকেন্ড ইয়ার।’

‘আমি থার্ড ইয়ার। তোমার সাবজেক্ট?’

‘ইংলিশ।’

‘ফাইন। আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স। ফালতু একটা সাবজেক্ট।’

‘আসলে আমার সাবজেক্টটাই ফালতু। কি যে সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কবিতা! শুনলে কান দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করে। পড়াতে গিয়ে স্যাররাও বিব্রত হন। কিছু লুইস স্যার অবশ্য মজা পান।’

হেসে ফেললো মেয়েটা। ‘তুমি তো খুব মজা করে কথা বলো! তোমার নামটা কি ভাই?’

‘মাহিন।’

‘তোমার নামটাও কিন্তু সুন্দর। আনকমন নাম।’

কিছু বললাম না। কিছু বলার নেই আসলে। মেয়েটার নাম অবশ্য জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু এ মেয়ের নাম দিয়ে আমার কাম কি? আসলে এ মুহূর্তে চান্দি গরম হয়ে আছে আমার। সোয়া একটা বাজে। ঠিক একটায় হাসিনের আসার কথা। এখনো পাত্তা নেই গাধাটার। টিপ টিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কলেজ গেইটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। না, কথাটা ভুল বললাম। বলা উচিত ছিলো টিপ টিপ বৃষ্টি ছাতার মাথায় নিয়ে কলেজ গেইটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কারণ, বৃষ্টি পড়লেও আমার মাথায় পড়ছে না। পড়ছে ছাতার উপর।

সময়মতো না আসাটা হাসিনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে আসলে। আবারো ভুল বললাম। বলা উচিত ছিলো বদ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু আজ না, প্রত্যেক দিন, অর্থাৎ প্রতিবারই দেরি করে আসছে। লেট লতিফ আর ওর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এখন। কবে যে ও মানুষ হবে! ও যতো দেরি করে আসবে ততো লস আমার; ওর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবো; কারণ চারটের মধ্যে অবশ্যই বাসায় ফিরে যেতে হবে আমাকে।

গেইটের সামনে রিকশা আর ছাত্রীদের জটলা লেগে গেছে রীতিমতো। মাছের বাজারের মতো চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে। রিকশার তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। তার ওপর বৃষ্টি। এ সুযোগে আপাদের কাছে অনেক বেশি ভাড়া হাঁকছে রিকশাচালকরা।

হঠাৎ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো একটা ছেলে। আমার ছাতার নিচে দাঁড়ানো মেয়েটার উদ্দেশে বললো, ‘চলো।’

আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো মেয়েটা, ‘আসি হ্যাঁ?’

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালাম।

রাস্তার উল্টো দিকের ফুটপাতে ভিড় করে দাঁড়ানো রোমিওদের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। এক এক করে জুলিয়েটরা গেইট দিয়ে বেরিয়েছে, আর তারা প্রাপ্তির আনন্দে হেসে এগিয়ে এসেছে। তারপর রিকশায় বা একই ছাতার নিচে বাকবাকুম করতে করতে চলে গেছে রোমিও-জুলিয়েটরা। অথচ আমার গাধুটা এখনো এলো না। এবার আসুক তারে আমি মজা দেখাবো। কিন্তু কি মজা দেখাবো? ধাম করে পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু এই প্রকাশ্য দিবালোকে এবং এতো লোকজনের সামনে সম্ভব হবে না এটা। অতএব শাস্তিটা দিতে হবে পরে।

আচ্ছা, ইচ্ছে করে দেরি করে শোধ নিচ্ছে না তো? খুব রেগে আছে ও আমার ওপর। যদিও আমার কোনো দোষ নেই ব্যাপারটায়। গতকাল সারাটা দিন আর রাত একটা ফোন করতে পারিনি ওকে। একটা মিসকলও পাঠাতে পারিনি। সব আব্বুর জন্যে। সবসময় কর্ডলেসটা ছিলো তার হাতে। টিভি দেখার সময়, এমনকি

খাওয়ার সময়ও ওটা পাশে ছিলো। কি সব জরুরী ফোন আসবে বলে এ অবস্থা। সন্ধ্যার পর একবার মিসকল পাঠিয়েছিলো ও। এর বেশ কিছুক্ষণ পর একটা ফোন এসেছিলো। আব্বু হ্যালো বলার পরই কেটে গেলো। সবই বুঝেছিলাম কিন্তু কিছুই করার ছিলো না। ওর সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য অস্থির হয়ে ছিলাম।

তো আজ সকালে মিলে গেলো সুযোগ। কলেজে যাওয়ার আগ দিয়ে ফোন করলাম ওকে। এমনিতে ওর কণ্ঠস্বর সুন্দর, ভরাট। সেই ভরাট কণ্ঠস্বর আরো ভরাট অর্থাৎ গম্ভীর করে হ্যালো বললো ও। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম গাল ফুলিয়েছে বাবু। মন বা মেজাজ খুব খারাপ থাকলে এভাবে হ্যালো বলে ও।

শেষে জানলাম গতকাল সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে গিয়েছিলো ও। শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। মিসকল ওর জানতাম। কিন্তু তখন ও যে আমার বারান্দার কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে কল্পনাও করিনি। এভাবে অবশ্য আগেও কয়েকবার এসেছে ও। তবে সেটা টেলিফোনে যোগাযোগ করে। গতকাল সকাল এবং দুপুরেও মিসকল পেয়েছি ওর। কিন্তু আব্বুর জন্য ফোন করতে পারিনি। যোগাযোগ না করেই ও যে এভাবে আসবে কে জানে! সব শুনে খুব কষ্ট হলো আমার। বারবার সরি বললাম। তবু ছেলের মান ভাঙে না।

অনেক কথার পর গম্ভীর কণ্ঠেই হাসিন বলেছিলো, 'কিচ্ছু ভালো লাগছে না। তোর আজ কলেজ ছুটি হবে ক'টায়?'

'একটায়।'

'আমি আসবো।'

'তোর অফিস?'

'সকালে গিয়ে দ্রুত কাজ সেরে সরাসরি তোর ওখানে চলে যাবো।'

'সত্যিই আসবি তো?'

'না, মিথ্যে আসবো।'

'ঠিক হ্যায়, গেইটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো আমি। দেরি করিস না কিন্তু।'

'দেরি হবে না। সময়মতো চলে আসবো।'

দেড়টা বাজে প্রায়। এখনো আসেনি হাসিন। এই হচ্ছে ছাগলটার সময়মতো আসার নমুনা। রাগে দুঃখে কান্না পাচ্ছে আমার। লোকজনের সামনেই নিঃশব্দে কাঁদা যায় এখন। কেউ কিছু টের পাবে না। তবে সেক্ষেত্রে ছাতাটা বন্ধ করে নিতে হবে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কান্না। চোখের পানি আর বৃষ্টির পানি এক হয়ে মিশে যাবে।

হঠাৎ আইল্যান্ডের ওপারের রাস্তায় দেখতে পেলাম ওকে। রিকশা থেকে নামছে। ভাড়া মিটিয়ে রাস্তা পেরুতে শুরু করলো। আমাকে দেখেই লাজুক ভঙ্গিতে হাসলো। আমি হাসলাম না। কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলাম। প্রতিবারই দেরি করে এসে এভাবে লাজুক ভঙ্গিতে হাসে। চালাকি আর কি! হেসে আমার রাগ ভাঙানোর চেষ্টা। আমি কিছু বুঝি না মনে করেছে? ওর লাজুক হাসির খ্যাতা পুড়ি আমি!

'সরি দোস্ত, দেরি হয়ে গেলো!' আমার ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে কাচুমাচু ভঙ্গিতে বললো ও।

'এ আর নতুন কি!'

'না... মানে হয়েছে কি...।'

'শুনতে চাচ্ছি না। বাসায় যেতে হবে আমাকে। একটা রিকশা ঠিক করে দে।'

'প্লিজ, রাগ করে না, সোনা!'

‘ডায়ালগ? ডায়ালগ দিয়ে আমাকে ভজানোর চেষ্টা? ব্যাটা বদ! সেই কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি!’

‘আর কোনোদিন দেরি হবে না।’

‘প্রতিবারই বলিস।’

‘এবার দু’হাতে কান ধরে বলছি।’

‘কান ধরে বল।’

‘সত্যি সত্যি ধরতে বলছিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘এতো মানুষের সামনে!’

‘হ্যাঁ।’

আশপাশে তাকিয়ে চট করে দু’হাতে কান ধরেই ছেড়ে দিলো ফাজিলটা। ওর ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললাম।

‘আর ঢঙ না করে তাড়াতাড়ি রিকশা ঠিক কর।’

‘এ বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবো?’

‘জানি না।’

দু’মিনিটের মধ্যেই রিকশা ঠিক করে আমাকে ডাকলো ও। উঠে বসলাম দু’জনে। বাঁ হাতে পর্দা টেনে ধরলাম। এখন আর টিপটিপ করে নয়, ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে। রিকশা চলতে শুরু করলো।

‘কোথায় যাচ্ছি আমরা?’

‘লালবাগ কেল্লা।’

কিছুক্ষণ ভদ্র বাবু হয়ে বসে রইলো ও। তারপরই অভদ্র হয়ে উঠলো ওর বাঁ হাত। বাঁ হাতে আমার ডান হাত চেপে ধরলো। ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিলাম। কিন্তু বান্দা তো দমবার পাত্র নয়। আবারো হাত চেপে ধরলো।

প্রবল ভালোলাগায় ভেসে যেতে যেতে কৃত্রিম ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললাম, ‘হাত ছাড়!’

আঁৎকে উঠে ইশারায় রিকশাঅলাকে দেখালো ও।

মুচকে হেসে বললাম, ‘হাত না ছাড়লে আরো জোরে বলবো!’

কড়া দৃষ্টিতে তাকালো ও। আরো জোরে চেপে ধরলো হাত। প্রচণ্ড ভালো লাগলেও মুখ হাঁড়ি করে বসে রইলাম।

কেল্লা কাছিয়ে আসতে বললাম, ‘এই বৃষ্টির মধ্যে কেল্লায় যাওয়ার কোনো মানে হয়?’

‘কেন কি সমস্যা?’

‘দাঁড়াবো কোথায়?’

‘তাই তো! আগে বলিসনি কেন!’

‘মনে ছিলো নাকি ছাই মাথা!’

'কোথায় যাওয়া যায় তাহলে? পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে গিয়েও তো লাভ নেই।'

'জাদুঘরে যাওয়া যায়।'

'ঠিক!' বলে রিকশাঅলাকে বললো, 'এই যে ভাই, জাদুঘর যাবেন? জাদুঘর নিয়ে যান আমাদের।'

কিছু না বলে রিকশা ঘোরালো রিকশাঅলা।

মনে মনে হাসছি আমি। ব্যাপারটা আগে ইচ্ছে করেই বলিনি। বললে কলেজ গেইট থেকে সরাসরি জাদুঘর বা অন্য কোথাও যেতে হতো। ফলে ওকে কম সময়ের জন্যে এভাবে পাশে পেতাম। বৃষ্টির মধ্যে এভাবে ওর পাশে বসে রিকশায় ঘুরতে কি যে ভালো লাগে আমার!

আমার ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে হাসিন ওর বাঁ হাতের আঙুলগুলো ঢোকাতে চেষ্টা করছে। ঢোকানোর পর শক্ত করে আমার হাতের তালু চেপে ধরে রাখবে। রিকশা বা স্কুটারে উঠলেই এমন করে ও। ভীষণ, ভীষণ ভালো লাগে আমার। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার কাণ্ডকারখানা বলছে অন্য কথা। ব্যাপারটা যেন ভীষণ, ভীষণ অপছন্দ করি আমি; তাই হাতের তালু খুব শক্ত করে আঙুলগুলো চেপে ধরে আছি– যাতে আঙুল ঢোকাতে না পারে ও। প্রাণপণে চাপ দিচ্ছে ও। এক সময় হার মানলাম আমি। ইচ্ছে করে। গাধুটা বুঝলো না। চেহারায় বিজয়ীর ভাব নিয়ে তাকালো আমার দিকে।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ছুটে চলেছে রিকশা। আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে ভীষণ শক্ত করে আমার ডান হাত চেপে ধরে আছে হাসিন। দু'জনেই তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করছি পরস্পরের অস্তিত্ব। আশ্চর্য এক ভালোলাগায় ডান হাত কেমন অবশ হয়ে আছে আমার। রিমঝিম করে বৃষ্টি ঝরছে।

পাঁচ

অফিসে এসেছি ঘন্টাখানেক হয়ে এলো। অথচ একটু কাজও করতে পারিনি এর মধ্যে। কিছুতেই মন বসছে না। গতকাল রাতে আবারো দেখেছি ওই স্বপ্নটা। এঁকেবেঁকে দূর বহুদূর চলে গেছে একটা রাস্তা। আমি আর মাহিন পাশাপাশি হাঁটছি সেই রাস্তা দিয়ে। দু'ধারে সবুজ ফসলের মাঠ। হঠাৎ দূর থেকে লঞ্চের ভেঁপু ভেসে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায়।

একই স্বপ্ন কেন বারবার দেখছি! এর মধ্যে কি কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে? সুদূর সেই কৈশোরে এমন একটা স্বপ্ন কেমন করে যেন মাথায় ঢুকে গিয়েছিলো। কোনো এক প্রিয় মানুষকে পাশে নিয়ে স্বপ্নে দেখা এমনি এক রাস্তা ধরে হেঁটে যাবো। সে রাস্তার শেষ মাথায় স্বপ্নের মতো সুন্দর একটা নদী, একটা লঞ্চঘাট। হাঁটতে হাঁটতে সেই ঘাটে গিয়ে পৌঁছুবো আমরা। তাকে নিয়ে লঞ্চে চড়বো। বুকের ভেতর সঙ্গোপনে প্রায়ই নাড়াচাড়া করতাম আমার এ স্বপ্নবিলাস। অলস দুপুর আর নিঃসঙ্গ রাতে কোনো এক অজানা মানবীকে নিয়ে হারিয়ে যেতাম সেই স্বপ্নের রাজ্যে।

সম্ভবত কৈশোর পেরুবার পরই বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম আমার এ স্বপ্নবিলাসের কথা। তারপর... অনেক বছর পর একদিন হঠাৎ পরিচয় হলো মাহিনের সঙ্গে। পরিচয় থেকে সম্পর্ক হলো এক সময়। তারপর ধীরে ধীরে গাঢ় হলো সে সম্পর্ক। এরপরই হঠাৎ একদিন মনে পড়ে গেলো কৈশোরের সেই স্বপ্নবিলাসের কথা। আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করলাম, এই তো সেই মেয়ে! একে নিয়েই তো সেই ছেলেবেলা থেকে হেঁটে চলেছি আমি চির পরিচিত সেই আঁকাবাঁকা পথটি ধরে!

একদিন মাহিনকে পুরো ব্যাপারটা গল্পের ছলে লিখে জানালাম। পড়ে চমৎকৃত হলো ও। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করলো। কিন্তু যখন জানলো ব্যাপারটা আমার জনম জনমের বাসনা, হতভম্ব হয়ে গেলো।

এর কয়েক মাস পর হঠাৎ একদিন রাতে স্বপ্নে দৃশ্যায়িত হলো আমার স্বপ্নবিলাস। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই দেখি এ স্বপ্নটা। প্রতিবারই হুবহু এক স্বপ্ন। একটা অর্ধ সমাপ্ত স্বপ্ন। প্রতিবারই লঞ্চের ভেঁপু শুনে ঘুম ভেঙে যায়। তখন কি যে কষ্ট হয় আমার! সারাটা দিন মন খারাপ থাকে।

যেমন আজ মন খারাপ। মন খারাপ অবস্থায় আর যা-ই হোক পাঠকের লেখা ঠিকমতো সম্পাদনা করা যায় না। তার ওপর সে লেখা যদি হয় টুকরো গল্প তাহলে তো কথাই নেই। সবচেয়ে সমস্যা হয় এই টুকরো গল্প নিয়ে। গল্পের নামে একেকজন যা লেখে না! বেশিরভাগই অখাদ্য। সম্পাদনা করে করে এসব অখাদ্যকে খাদ্য বানাতে হয়। তাও যদি নিয়ম মেনে লিখতো। হাজারবার বলার পরও দু'লাইনের মাঝে পর্যাপ্ত ফাঁক রাখে না অনেকে, টুকরো-টাকরা কাগজে লিখে পাঠায়, অনেকে কাগজের উভয় পিঠে লেখে, কেউ কেউ আবার টুকরো গল্পের নামে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিখে পাঠায়– ইত্যাদি নানান হাঙ্গামা।

আট পৃষ্ঠার একটা ট্যাবলয়েডের দায়িত্বে আছি। মূলত ফান ট্যাবলয়েড এটা। প্রতি শুক্রবার বেরোয়। বেশিরভাগ লেখাই পাঠকের। লিখতে লিখতে অনেক শক্তিমান লেখক তৈরি হয়ে গেছে। চমৎকার সব লেখা পাঠাচ্ছে তারা। কিন্তু এদের বেশিরভাগই কেন যেন টুকরো গল্প লিখতে চায় না। সম্ভবত ৩৫০ শব্দের মধ্যে লিখতে হয় বলে। ৩৫০ শব্দের মধ্যে গল্প লিখতে দারুণ মুন্সিয়ানার প্রয়োজন।

তো শিডিউল অনুযায়ী টুকরো গল্পের ফাইলটা আজ ছাড়তেই হবে। না ছেড়ে উপায় নেই; সময়মতো কম্পোজ কারেকশন হবে না; পেস্টিং-এর দিন ঝামেলায় পড়বো। কিন্তু কাজে মন বসছে না। বারবার চোখের সামনে সেই লঞ্চঘাটটা ভেসে উঠছে, সাদা ডানায় রোদের ঝিলিক তুলে উড়ে বেড়াচ্ছে গাঙচিলেরা।

'স্যারের শরীলডা কি খারাপ?'

অফিস বয় মাকসুদ মিয়ার কথায় চমকে বাস্তবে ফিরে এলাম।

'অ্যাঁ? না, শরীর ভালোই আছে মাকসুদ মিয়া', বলে জোর করে খানিকটা হাসি।

'তাইলে স্যারের মন খারাপ।'

'ঠিক। তা আমার মনটা কি তুমি ভালো করে দিতে পারো?'

হতভম্ব দেখায় মাকসুদ মিয়াকে, 'স্যার, আমার কাছে মন ভালো করার ওষুধ থাকলে সব আপনেরে দিয়া দিতাম। কিন্তুক...।'

'কোনো কিন্তুক নয়, ওষুধ তোমার কাছে আছে।'

'আমার কাছে!'

'হ্যাঁ। ঝটপট আগুন গরম এক কাপ রঙ চা খাওয়াও। প্রথম চুমুক দেবার পর দ্বিতীয় চুমুক দেবার আগেই মন ভালো হয়ে যাবে। যাও। কুইক!'

মুচকে হেসে চলে যায় মাকসুদ মিয়া। পাঁচমিনিটের মধ্যে চা নিয়ে ফিরে আসে। প্রথম চুমুক দিয়েই ইচ্ছে করে 'আহ্!' বলে উঠি। আনন্দে ঝলমল করতে করতে ফিরে যায় সে। তার আনন্দিত হবার কারণ আছে। চা'টা তার নিজের হাতে বানানো। সিঁড়ির কোণে ছোট্ট একটা টি স্টল দিয়েছে সে। টি স্টল কাম সিগারেট স্টল। চা-সিগারেট বেচে ভালোই বাড়তি আয় হয় তার।

আগুন গরম চা। তবু ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছি। গরম চা খেলে আসলেই মন খারাপ কেটে যায়। অন্তত কিছুটা সময়ের জন্য হলেও। না, চায়ে এমন কোনো উপাদান নেই যা মন ভালো করে দেয়। ব্যাপারটা হলো, মন খারাপ থাকলে মানুষ আনমনা হয়ে যায়। মুখ বেজার করে চুপচাপ ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে বারবার

অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এ সময় গরম চা মুখের ভেতর পড়লে ঝাঁকি খায় পুরো শরীর। শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ফলে সে মনকে আনমনা হতে দেয় না।

কিছুক্ষণ পর কাপ নিতে আসে মাকসুদ মিয়া। 'আচ্ছা মাকসুদ মিয়া, তোমাদের গ্রামে কি কোনো লঞ্চঘাট আছে?'

'কি যে কন স্যার, থাকবো না ক্যান? লঞ্চে কইরাই তো বাড়ি যাই আমি।'

'তোমাদের গ্রাম থেকে লঞ্চঘাটে যাওয়ার রাস্তাটা কি আঁকাবাঁকা? দু'পাশে সবুজ ফসলের মাঠ?'

'না স্যার, আমাগো গ্রাম তো নদীর পাড়েই। বাড়ী থিকা লঞ্চঘাট দেহা যায়। ক্ষেতের আইল দিয়া হাইটা ঘাটে যাইতে হয়। ক্যান স্যার?'

'না, কিছু না। আচ্ছা, লঞ্চঘাটে কি গাঙচিল আছে?'

'গাঙচিল নাই। তয় অনেক মাছরাঙা আর কানি বক আছে। সারাদিন খালি মাছ খায়।'

'অ। যাও একটা সিগারেট নিয়ে আসো।'

মাকসুদ মিয়ার কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। গরম চায়ের অ্যাকশন হচ্ছে না মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়ায়। এতোক্ষণ ছিলো মন খারাপ, এখন মেজাজ। আরে শালার ক্ষেতের আইল আর কানি বক দিয়ে আমি করবোটা কি! আমার দরকার আঁকাবাঁকা রাস্তা আর গাঙচিল।

সিগারেট নিয়ে আসে মাকসুদ মিয়া। ধরাতে ধরাতে বলি, 'আচ্ছা মাকসুদ মিয়া, তোমাদের ওদিকে অন্যান্য গ্রামে তোমার আত্মীয়-স্বজন আছে না?'

'অনেক আছে, স্যার। পরায় প্রত্যেকটা গ্রামে। আর পাশের গ্রামে তো আমার শ্বশুরবাড়ি, স্যার।'

'ওসব গ্রামে লঞ্চঘাট আছে?'

'থাকবো না ক্যান্ স্যার? আমাগো ওদিকে তো নদী ছাড়া পথ নাই।'

'গুড। তো ওখানে এমন কোনো লঞ্চঘাট নেই যেখানে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে যেতে হয়?'

'রাস্তা আছে, স্যার, তয় সব সোজা। বেকা ত্যাড়া নাই।'

'ঠিক আছে তুমি এখন যাও।'

কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায় মাকসুদ মিয়া। পিছিয়ে এসে ভুরু কুঁচকে বলে, 'আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়া কি করবেন স্যার?'

'গোল্লাছুট খেলবো। তুমি এখন যাও।'

থতমত খেয়ে গম্ভীর মুখে চলে যায় মাকসুদ মিয়া। পুরোপুরি হট হয়ে গেছে মেজাজ। আরেকটু হট হলে মাথা দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করবে। মেজাজ ঠাণ্ডা করতে কষে কষে টান দিচ্ছি সিগারেটে। তবু ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

যার জন্য আমার এ অবস্থা উনি এ মুহূর্তে কি করছেন কে জানে। হয়তো সিডি প্লেয়ার ছেড়ে দিয়ে গান শুনছেন। তা গান শুনুন আর ধেই ধেই করে নাচুন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু একটা ফোন তো করতে পারতো? অন্তত একটা মিসকল? আমি সিগন্যাল দিলে তারপর ফোন করবে; এটা কোন ধরনের কথা? কেন, নিজ থেকে একটা ফোন করা যায় না? আমি বেঁচে আছি নাকি ওকে অ্যাডভান্স বিধবা বানিয়ে দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছি সে খবরটা তো নেয়া উচিত, নাকি? আশ্চর্য! নাকি আজো হবু শ্বশুর আব্বাজান হাতে কর্ডলেস নিয়ে বসে বসে ডিমে তা দিচ্ছেন? বলা যায় না দিতেও পারেন। যেমন মেয়ে তেমন তার বাপ!

ছয়

মগবাজার মোড়ের ঐতিহাসিক জ্যামে আটকা পড়ে আছি। সামনে পেছনে কোনোদিকে যাওয়ার উপায় নেই। শ্রাবণ মাস চলছে। অথচ কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না। প্রচণ্ড গরম পড়েছে আজ। গুমোট আবহাওয়া। রিকশায় বসে কুল কুল করে ঘামছি। ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুর মনে হচ্ছে নিজেকে।

কষ্টের কষ্ট তার ওপর টেনশন। তিনটার মধ্যে বাসায় পৌঁছে যাওয়ার কথা আমার। অথচ এখন বাজে সাড়ে তিনটা। নির্ঘাত আজো ভাইয়ার বাঁকা কথা শুনতে হবে। ইদানীং কলেজ থেকে ফিরতে একটু দেরি হলেই ভীষণ রাগারাগি করে। রাগারাগিটা অবশ্য সরাসরি আমার সঙ্গে করে না। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করে বলে, 'কলেজ থেকে ফিরতে এতো দেরি হয় কেন ওর? কোথায় যায়?'

আম্মুকে, ভাবিকে জ্যামের কথা বলেছি। কলেজ থেকে ফেরার সময় প্রায়ই জ্যামে পড়তে হয়। জ্যামে আটকা পড়লে বাসায় ফিরতে দেরি হতেই পারে। কারণ দর্শাও নোটিশের উত্তর জানানো হয়েছে ভাইয়াকে; কিন্তু আমার গোঁয়ারগোবিন্দ ভাইয়া এ যুক্তি মানতে নারাজ। কেন যেন তার ধারণা হয়েছে, কলেজ ছুটির পর কার সঙ্গে যেন টাংকি মেরে বেড়াই আমি। এ কারণেই ফিরতে দেরি হয় । কাজেই যেদিন আমার বাসায় ফিরতে দেরি হয় সেদিনই চিল্লাচিল্লি করে বাড়ি মাথায় তোলে। আজো তুলবে। ভাবতেই কান্না পাচ্ছে।

আধঘণ্টা ধরে আটকা পড়ে আছি জ্যামে। এই আধঘণ্টায় একহাতও সামনে বাড়তে পারেনি আমার রিকশা। অনেকেই রিকশা থেকে নেমে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আমার সে উপায় নেই। কারণ, আমি তাদের মতো পুরুষ বা ছেলে নই। মেয়ে। রিকশা থেকে নেমে হাঁটতে গেলে সুযোগ সন্ধানী লোচ্চা পুরুষগুলো হয় ধাক্কা দেবে নয়তো কনুই দিয়ে গুঁতো দেবে। এ জাতীয় পুরুষরা যে কি জিনিস অসহায় মেয়েরা ছাড়া কেউ জানে না। সবচেয়ে ইতর হচ্ছে মাঝবয়সী পুরুষগুলো। এদের বৌ আছে, আমাদের সমান মেয়ে আছে কিন্তু লজ্জা নেই। এমন কুৎসিত ভঙ্গিতে তাকায়! মনে হয় যেন চোখ দিয়ে শরীর স্ক্যান করছে। কয়েক প্রস্থ পোশাক পরে থাকলেও মনে হয় শরীরে যেন কোনো পোশাক নেই। তীব্র ঘেন্নায় বমি এসে যায়। আর গাউছিয়া মার্কেটে আছে বদমাশ ছেলেদের গ্রুপ। আশপাশের হলগুলো থেকে দল বেঁধে আসে। দল বেঁধে ভিড়ের মধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মিশে থাকে। সুযোগ পেলেই মেয়েদের শরীরে হাত চালিয়ে দেয়। ক্লাসের অনেক মেয়ের কাছে শুনেছি এ ঘটনা। তাই শপিঙে গাউছিয়া গেলে ব্যাগটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে হাঁটি।

প্রচণ্ড গরমে কাহিল হয়ে পড়েছি। অসহ্য লাগছে। এই জ্যাম কখন ছুটবে কে জানে! ইস্, এখন যদি পাশে হাসিনটা থাকতো! একটুও কষ্ট হতো না আমার। পুটুরপাটুর করে গল্প করতাম দু'জনে। ও যে কি দুষ্টু! কি যে মজার মজার সব কথা বলে! শুনে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যায়। ফাজিলটা মাঝে মাঝে অসভ্য কথাও বলে। অবশ্য সরাসরি না, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে, ভাষা ব্যবহার করে। ভীষণ লজ্জা লাগলেও শুনতে মজাই লাগে। কিন্তু মজা লাগাটা প্রকাশ করি না। কৃত্রিম রাগের ভান করি। মেয়েদের এটা করতে হয়। তো হাসিনটা এ মুহূর্তে পাশে থাকলে আমার কোনো কষ্টই হতো না। চুপটি করে ও পাশে বসে থাকলেও চলতো। ওর ছোঁয়া নিয়ে আমিও চুপচাপ বসে থাকতাম। জ্যামের কথা মনেই থাকতো না। বরং বাসার কাছাকাছি এসেও রিকশা থেকে নেমে পড়লে মনে হতো– এতো তাড়াতাড়ি চলে এলাম!

আমার একটা মোবাইল থাকলে কি যে ভালো হতো! রিকশায় বসে বসে এখন ওর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। ও যা পাগল! জ্যামের কথা শুনে নিশ্চয়ই বলতো, 'দাঁড়া, দশমিনিটের মধ্যে চলে আসছি।'

সেদিন ওকে ফোন করিনি বলে খুব রাগ করেছিলো। সেদিনও নাকি রাতে আবার ওই স্বপ্নটা দেখেছে। এ স্বপ্নটা দেখলেই নাকি ওর মন খারাপ হয়ে যায়। অফিসে গিয়ে কাজে মন বসাতে পারছিলো না। খুব আশা করছিলো আমার একটা ফোনের। কিন্তু আমি তো তখন কলেজে। ফোন করবো কি করে?

সামনের একটা রিকশায় তিনজন ছেলে বসেছে। একজন বসেছে সিটের হেলান দেয়া অংশটার উপর। মাঝে মাঝেই ছেলেটা ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে শয়তানের মতো হাসছে। অসহ্য! কষে

একটা চড় লাগাতে ইচ্ছে করছে শালার গালে।

রিকশার হুড ভেদ করে যেন সূর্যের আলো লাগছে গায়ে। প্রচণ্ড গরমে হাফ বয়েল হয়ে গেছি একেবারে। আফ্রিকার জংলীরা আমাকে এ মুহূর্তে পেলে লবণ ছাড়াই খুব মজা করে খেতো। ঘেমে নেয়ে গেছি একেবারে। জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে। জঘন্য সিচুয়েশন। বদটা পাশে থাকলে এ নিয়ে কি যে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলতো! হয়তো বলে বসতো, 'খেয়ে খেয়ে তো আড়াইমণি আটার বস্তা হয়েছিস। তুই এভাবে ঘামবি না তো কে ঘামবে। একি, ঘামে তো জামা ভিজে গেছে দেখছি! আরেকটু পর তো পাজামা ভিজবে!' ছি ছি কি লজ্জার কথা! কি এমন মোটা আমি? অথচ শয়তানটা এমনভাবে খোটা দেয় যে ...!

গরমে হাসিনও অবশ্য খুব ঘামে। স্লিম ফিগার ওর। তবু সামান্য গরমে বিচ্ছিরিভাবে ঘামে ও। নাক মুখ কুঁচকে একদিন ওকে বলেছি, 'পেট্রোলের গন্ধ বেরুচ্ছে তোর শরীর থেকে! বাসায় গিয়েই সাবান দিয়ে গোসল করবি।'

শুনে চোখ-মুখ লাল হয়ে গিয়েছিলো বেচারার। ওকে বিব্রত করতে পেরে দারুণ মজা লেগেছিলো। উল্টোটা বলেছিলাম আসলে। গাধাটার ঘামের গন্ধ কি যে মিষ্টি!

জ্যাম আরো ভালোভাবে লেগেছে মনে হচ্ছে। একটা প্রাইভেট কার অহেতুক থেকে থেকে হর্ন বাজাচ্ছে। কানে লাগছে খুব। অসহ্য! ভাবখানা এমন, যেন হর্ন বাজালেই জ্যাম ছুটে যাবে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এসি চলছে গাড়ির ভেতর। পেছনে সিটে এক ননীর পুতুল টাইপ সুন্দরী বসে আছে। ড্রাইভার যে ননীর পুতুলের নির্দেশে হর্ন বাজাচ্ছে তা নিশ্চিত। এসি গাড়িতে বসে থেকেও এতো কষ্ট! ননীর পুতুলটাকে গাড়ি থেকে বের করে এনে আমার রিকশায় কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখলে কি করবে ভাবছি। সম্ভবত পাঁচমিনিটের মধ্যে মাথা ঘুরে রাস্তায় ঠাস করে পড়ে যাবে। সেদিন এদের ব্যাপারে কথা হচ্ছিলো ক্লাসে। মুমু বললো, এরা নাকি ভুলেও কোনোদিন রান্নাঘরে ঢোকে না। কারণ, চুলার আগুনের সামান্য একটু আঁচ লাগলেও নাকি ফুচকার মতো বড়ো বড়ো ফোস্কা পড়ে যায় এদের শরীরে। শুনে ক্লাসের মেয়েদের সে কি হাসি!

মুমু আরো বলেছে, ভুঁড়িঅলা ধনীরা ঘর সাজাবার জন্য শোপিস হিসেবে বিয়ে করে এসব ননীর পুতুল। বাসায় বন্ধুদের দাওয়াত করে নিজের সুন্দরী বৌ দেখিয়ে গর্ব অনুভব করে। বিভিন্ন পার্টিতে নিয়ে গিয়ে সিনা টান টান করে ঘোরে।

শুনে আফসোসের ভঙ্গিতে কেয়া বললো, 'যাই বলিস ভাই লাইফটা ইনজয় করতে পারে এরা। কোনো কাজই করতে হয় না! চিন্তা করতে পারিস! আল্লাহ্ যে কেন ননীর পুতুল করে দুনিয়াতে পাঠালো না!'

সমস্বরে হেসে উঠলো সবাই। হাসি থামতে মুমু কেয়াকে বললো, 'এরা লাইফ ইনজয় করে ঠিক। কিন্তু বছরদশেক পরই লাইফ এদের ব্যঙ্গ করে।'

'সেটা কেমন?'

'কাজ না করে শুধু খাওয়া আর ঘুম দিলে যা হয় আরকি! ছিপছিপে দেহখানি ড্রাম সাইজ হয়ে যায়। হাই প্রেশারে ভোগে, মূত্রবিষয়ক যন্ত্রণা অর্থাৎ ডায়াবেটিস হয়। ফলে, বিছানায় পড়ে থেকে কোঁ কোঁ করে। আর স্বামী প্রবর ওদিকে পরকীয়ার নৌকায় পাল তুলে ভেসে বেড়ায়! '

চোখ বড়ো বড়ো করে আতঙ্কিত সুরে মুমু বললো, 'আল্লাহ্ ননীর পুতুল করে পয়দা করেনি বলে হাজার শোকর ভাই!'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে ফের একসঙ্গে হেসে উঠেছিলো সবাই।

রাস্তার পাশে রিকশা ভ্যানের মতো গাড়িতে চানাচুর বিক্রি হচ্ছে। কাঁচ দিয়ে ঘেরা ভ্যানের পেছনের অংশ। ভেতরে বিভিন্ন আয়তনের চানাচুরের প্যাকেট স্তূপ করা। খোলা চানাচুরের স্তূপও আছে একটা। আর আছে একটা দাঁড়িপাল্লা। ঢাকা শহরে নতুন চালু হয়েছে এ ট্রেন্ড। প্রচণ্ড এ গরমে পানি বা আইসক্রিম না পেয়ে অনেকেই চানাচুর কিনছে। ঠোঙ্গায় ভরে পাল্লায় মাপ দিচ্ছে বিক্রেতা। তারপর লবণ দিয়ে ঠোঙ্গা একটু ঝাঁকিয়ে

ক্রেতার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ ভ্যানের গায়ে লেখা চানাচুরের নামের দিকে চোখ পড়তেই ফিক করে হেসে ফেললাম। জামাই বউ চানাচুর। হাসিন এ মুহূর্তে সঙ্গে থাকলে পাঁচটাকার কিনে ভাগাভাগি করে খাওয়া যেতো জামাই বউ চানাচুর। মুশকিল হচ্ছে জামাই এখন পাশে নেই। বউ একা একা রিকশায় বসে চানাচুর খায় কোন আক্কেলে?

সাত

'আপনি হালায় একটা তারছিঁড়া পাবলিক। এই রাত করে মুন্সিগঞ্জ আসার কোনো মানে হয়!' ফেরিঘাটের দিকে এগুতে এগুতে বিরক্ত স্বরে বললো টিপু।

বাস থেকে নেমেছি একটু আগে। প্রায় সাতটা বাজে। মতিঝিল থেকে বাস ছেড়েছে সাড়ে পাঁচটায়। দেড়ঘণ্টা লেগেছে মুক্তারপুর পৌঁছুতে। শীতলক্ষা নদীর ওপারে মুন্সিগঞ্জ শহর। ফেরিতে করে যেতে হয়। আহমেদ আতিক বলেছে আধঘণ্টা লাগে ফেরিতে। মূলত ফেরিতে চড়ার লোভেই রাত করে এখানে আসা।

আজ বুধবার। অফিসে কাজের তেমন চাপ ছিলো না। আমার ট্যাবলয়েডটার পেস্টিং হয়ে গেছে গতকাল। স্বভাবতই আজ তেমন একটা কাজ ছিলো না। কিছুক্ষণ কাজ করে নিচের ফ্লোরে নেমে এলাম। এটাও ফিচার সেকশন। আমাদের দৈনিকের বেশিরভাগ ফিচার পাতা এখান থেকে বেরোয়। টিপু এ সেকশনেই কাজ করে। দুটো পাতার দায়িত্বে আছে ও। মনমানসিকতা মেলে বলে আমার সঙ্গে বেশ সখ্য। একই দিকে বাসা বলে প্রায়ই অফিস থেকে একসঙ্গে বের হই। বেশ মিশুক, রসবোধ প্রবল। ফলে সঙ্গটা উপভোগ্য।

টেবিলে বসে কাজ করছিলো টিপু। জানি এখন বেরুতে পারবে না তবু হালকা চালে বললাম, 'কি, কাজ শেষ? বেরুবেন এখন?'

'এই তো কাজ প্রায় শেষ। বেরুতে পারবো।'

বলে কি! মুহূর্তে কল্পনার তুলিতে আঁকা মুন্সিগঞ্জ ফেরিঘাট ভেসে উঠলো চোখের সামনে। পুলকিত কণ্ঠে জানতে চাইলাম, 'কতোক্ষণ লাগবে আর?'

'এই পাঁচমিনিট? কেন?'

'এক জায়গায় যাবো।'

'কোথায়?'

'কথা কম। তাড়াতাড়ি কাজ সারেন,' বলে টিপুর টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারটায় বসে পড়লাম।

মাহিনের সঙ্গে দেখা হয় না বেশ অনেকদিন ধরে। টেলিফোনে অবশ্য রোজই কথা হয়। কিন্তু কথা বলে কি আর চোখের তৃষ্ণা মেটে? কতো দিন, কতো দিন ধরে দেখি না প্রিয় মায়াবতী মুখখানা! ভালো লাগছিলো না। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা বাসায় চলে যেতাম। বাতি নিভিয়ে আলো-আঁধারীতে শুয়ে থাকতাম চুপচাপ। চোখের সামনে খেলা করতো প্রিয় সেই মুখ। ওকে দীর্ঘদিন না দেখার কষ্ট বেড়ে যেতো শতগুণ।

টিপু রাজি হয়ে যাওয়ায় মনের মেঘলা ভাবটা কেটে গেছে। মুন্সিগঞ্জ ঘুরতে গেলে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে মন। সেই কবে থেকে ফেরিঘাটটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে! যাবো, যাচ্ছি করে করে যাওয়া হয়নি আজো। মুন্সিগঞ্জ ফেরিঘাটের কথা প্রথম শুনি বন্ধু ইসমাইলের কাছে। তা মাসতিনেক আগে তো হবেই।

'তুমি মুন্সিগঞ্জ শহরে যাওনি কখনো!' ভীষণ অবাক হয়ে বলেছিলো ইসমাইল।

বাঙালি হয়েও কোনোদিন ইলিশ-পান্তা খাইনি শুনলেও হয়তো এতোটা অবাক হতো না ও। কোথাও বেড়াতে

যাওয়ার ব্যাপারে কথা হচ্ছিলো সেদিন। আগে প্রতি বছরই কয়েক বন্ধু মিলে বেড়াতে বের হতাম। গত দু'বছর ধরে ব্যাপারটা বন্ধ। এর সময় হয় তো ওর সময় হয় না। এর এই সমস্যা তো ওর ওই সমস্যা। বিরক্ত হয়ে শেষে বুদ্ধিটা আমিই দিলাম। সবাই মিলে না হোক, দু'তিনজন মিলে মাঝে মাঝে একদিনের জন্যও তো ঘুরতে যেতে পারি আমরা। যেহেতু সময় মাত্র একদিন, ঢাকার কাছাকাছি স্পটগুলোতে বেড়াতে যাওয়া হবে। সকালে বেরিয়ে রাতে ফিরে আসবো।

ইসমাইল জানালো, মুন্সিগঞ্জ শহরে কয়েকবার গেছে ও। ওর চাচা পাবলিক হেলথ অফিসে চাকরি করতেন ওখানে। এখন অবশ্য বদলি হয়ে ফেনী চলে গেছেন। শহরটা ছোটো কিন্তু চমৎকার। চারধারে নদী। ফলে মাছ খুব সস্তা। দুধও সস্তা। হাটের দিন দশটাকা কেজি। ওখানে পরিবার নিয়ে মহাসুখে ছিলেন ওর চাচা। এখন ফেনীতে গিয়ে নাকি প্রবল আফসোস করেন।

আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করলো ফেরিঘাট। লঞ্চঘাট আর ফেরিঘাটের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই। ঘাটটা কি স্বপ্নে দেখা আমার সেই লঞ্চঘাটটার মতো? অস্থির হয়ে উঠলাম ওখানে যাওয়ার জন্য। মাহিনকে সঙ্গে নিয়ে গেলে তো আরো মজা হয়। কিন্তু অতো দূর যেতে কি ও রাজি হবে? কেউ যদি দেখে ফেলে আমাদের? খুব বেশি দূর অবশ্য না। সকাল সকাল বেরুলে ঘুরেটুরে তিনটের মধ্যে ফিরে আসা যায়। কয়েক দিন পর ফোনে ব্যাপারটা বললাম ওকে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে ও বললো, 'দোস্ত, মুন্সিগঞ্জ আমি গেছি।'

'কি বলিস! কবে!'

'এই তো মাসদুয়েক আগে।'

'হঠাৎ মুন্সিগঞ্জ কেন! কার সঙ্গে গেলি?'

'সবাই মিলে গিয়েছিলাম। আমাদের এক আত্মীয়ের মেয়ের বিয়ে ছিলো।'

'গাড়িতে করে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ।'

'ফেরি দিয়ে পার হয়ে নাকি যেতে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'ফেরির ওই জায়গাটা নাকি খুব সুন্দর?'

'ফেরিতে ওঠার আগেই রাত হয়ে গিয়েছিলো। তাই খেয়াল করতে পারিনি। তবে শহরটা সুন্দর।'

দু'দিন পর আমিনুলের সঙ্গে দেখা। পরিকল্পনা খুলে বললাম ওকে। সামনের কোনো ছুটির দিনে তিনজনে মিলে ঘুরতে যাবো ওখানে। ইসমাইল আর আমাকে অবাক করে দিয়ে আমিনুল জানালো, কোনোদিন মুন্সিগঞ্জ শহরে যায়নি ও। অথচ ও বিক্রমপুরের ছেলে!

আগামী শুক্রবার মুন্সিগঞ্জ যাওয়ার কথা আমাদের; কিন্তু হঠাৎ করে সমিতির একটা কাজ পড়ে গেছে শুক্রবার। ঘনিষ্ঠ ৯ বন্ধু মিলে করেছি সমিতিটা। নাম প্রত্যয় কল্যাণ সমিতি। সামান্য কিছু টাকা শেয়ার মার্কেট আর এদিক-ওদিক খাটছে। বাকি সব টাকা অহেতুক পড়ে আছে ব্যাংকে। গত মিটিঙে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ঢাকার আশপাশে কম দামে কিছু জমি কিনে ফেলে রাখা হবে। দাম বাড়লে বিক্রি করে দেবো বা ঘর তুলে ভাড়া দেবো। আমাদের এক বন্ধু মঞ্জু সাভার থাকে। ওখানে ভালো কয়েকটা জমির সন্ধান পেয়েছে ও। সেই জমি দেখতেই আগামী শুক্রবার সবাইকে যেতে হবে। ফলে, আমাদের ত্রিরত্নের ফেরি বিহার আপাতত স্থগিত রাখতে হয়েছে।

কিন্তু আজ যখন সুযোগ পাওয়া গেছে দ্বিরত্ন মিলে ফেরি বিহার করতে দোষ কি? পাঁচটার ওপর বাজে। পাঁচ মিনিটের কথা বলে টিপু এখনো কাজ করছে।

'ওই মিয়া, কতো সেকেন্ডে মিনিট হয় আপনার? পাঁচটা বেজে গেছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে তো।'

'এই তো হয়ে গেছে। আরেকটু। যাবেন কোথায় বলেন তো?'

'মুন্সিগঞ্জ।'

'এখন রওনা দেবেন মুন্সিগঞ্জ! পৌঁছতে পৌঁছতে তো রাত হয়ে যাবে।'

'যাক। সমস্যা কি?'

'আরেক দিন গেলে হয় না? আরো আগে রওনা দেবো?'

'টিপু, প্ল্যান করে বেড়ানো হয় না আসলে। হুট করে বেরিয়ে পড়তে হয়।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'তাড়াতাড়ি করেন ভাই। মুন্সিগঞ্জের বাস তো জয়কালি মন্দিরের ওখান থেকে ছাড়ে, না?'

'কি জানি, ওগুলো মনে হয় লোকাল। ডাইরেক্টগুলো দিলকুশার ওই মাথা থেকে ছাড়ে।'

'যাক, দ্রুত যাওয়া যাবে তাহলে।'

কাজ শেষ করে দ্রুত ব্যাগ গোছাচ্ছিলো টিপু। পাশ দিয়ে আহমেদ আতিককে যেতে দেখে বললো, 'মুন্সিগঞ্জ যাবে নাকি?'

'মুন্সিগঞ্জ যাচ্ছো তোমরা? ওহ্‌, দারুণ জায়গা! গত পরশু গিয়েছিলাম।'

বললাম, 'ফেরি পার হয়ে নাকি যেতে হয়?'

'বুড়িগঙ্গা ব্রিজ পার হয়ে সিরাজদিখান দিয়েও যাওয়া যায়। তবে ফেরি দিয়ে সবচেয়ে মজা।'

'ওখান দিয়ে যেতে হলে কিভাবে যেতে হবে?'

'মুক্তারপুরের বাসে উঠবেন। রাজউক বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ দিক থেকে ছাড়ে।'

'কতোক্ষণ লাগে ফেরিতে?'

'আধঘন্টা। ওফ্‌ফ্‌ ... চাঁদনি রাতে ফেরিতে কি যে মজা! কয়েক বন্ধু মিলে প্রায়ই যাই আমরা।'

'কে থাকে ওখানে?'

মুচকে হেসে টিপু বললো, 'আতিক মিয়ার অনেক বান্ধবী থাকে মুন্সিগঞ্জ।'

হাসতে হাসতে আতিক বললো, 'শহরের বিভিন্ন এলাকায় অনেক বান্ধবী আছে আমার। গেলে খালাম্মারা তো ছাড়তেই চায় না! বলে, রাতে থেকে যাও বাবারা!'

হেসে বললাম, 'খালাম্মারা কেউ জামাই বানাতে চায় না?'

'আরে তার জন্য তো সবাই একপায়ে খাড়া। তো কখন যাচ্ছেন আপনারা?'

'এক্ষুণি। চলেন যাই?'

'আধঘন্টা সময় দিলে যেতে পারি। জরুরি একটা কাজ সারতে হবে।'

‘এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, ভাই।’

‘আরে রাতেই তো ওখানে মজা।’

‘আপনাকে নিয়ে আরেক দিন যাবো নে। আজ আমরা যাই?’

‘ঠিক হ্যায়। নো প্রবলেম।’

টিপুকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম দ্রুত। দিলকুশা থেকে সাড়ে পাঁচটায় ছেড়েছিলো বাস। সাতটার একটু আগে মুক্তারপুর নেমেছি বাস থেকে। এ মুহূর্তে টিপু আর আমি রাস্তার ঢাল বেয়ে ফেরিঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছি। সময়মতোই এসেছি। ঘাটে লেগে আছে ফেরি। লাইন ধরে গাড়ি নামছে।

ফেরিতে উঠে ভিড় ঠেলে উল্টো দিকে চলে এলাম আমরা। এ প্রান্তটাই এখন সম্মুখ ভাগ, ওপারের পন্টুনে গিয়ে লাগবে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েকজন ঝালমুড়িঅলা রয়েছে ফেরিতে। মহাব্যস্ত প্রত্যেকে, দু’হাতে দ্রুত ঝালমুড়ি বানাচ্ছে। এ জিনিসটার প্রতি লোভ আমার ছোটবেলা থেকেই। সামনে পেলেই খাই। কিছুদিন ধরে অবশ্য বাইরের কিছুই খাচ্ছি না। বাইরের কোনো খাবারই সহ্য হচ্ছে না পেটে। বদহজম, এমনকি ডায়রিয়া টায়রিয়াও বাঁধিয়েছি কয়েকবার। খুব খারাপ অবস্থা। তবু কেন যেন এ মুহূর্তে ঝালমুড়ি খেতে খুব ইচ্ছে করছে। নদী থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে; ফেরির এঞ্জিনের একটানা গর্জন; আলো-আঁধারীর খেলা পুরো ফেরিজুড়ে; কেমন অপার্থিব একটা পরিবেশ। হয়তো বা কারণ এটাই। লোভী চোখে তাকিয়ে আছি এক ঝালমুড়িঅলার দিকে। এগিয়ে যাবো কিনা ভাবছি। ঠিক এমন সময় মাহিনের গা জ্বালানো কথাটা কানে প্রতিধ্বনি তুললো।

‘তোর তো জমিদারের পেট রে! কিছুই সহ্য হয় না। এ পেট নিয়ে তুই কিভাবে কি করবি!’

পেট খারাপের কথা শুনলেই হাসতে হাসতে এ কথাটা বলে বদ মেয়েটা। শুনে কি যে রাগ লাগে!

রাগ লাগুক আর যাই লাগুক, খোঁচামারা কথাটা মনে পড়ে যেতেই ঝালমুড়ি খাওয়ার ইচ্ছেটা উবে গেলো। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো সঙ্গে একটা সিগারেটও নেই। আশপাশে কোনো সিগারেটঅলাকেও দেখছি না। চলন্ত ফেরিতে একটা সিগারেট খেতে পারবো না এ কিছুতেই হতে পারে না। কাভি নেহি। চলন্ত ফেরিতে সিগারেট খাওয়ার মজাই আলাদা। তাছাড়া দু’টাকার ঝালমুড়ি পেট খারাপ করে দিতে পারে। কিন্তু এ জিনিস এক কার্টুন খেলেও পেটের কোনো সমস্যা হবে না!

টিপুকে জানালাম সঙ্গে সিগারেট নেই। ফেরিতেও কোনো সিগারেটঅলা নেই। ফেরি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি সিগারেট কেনার তাগাদা দিলো টিপু। শখে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে খায়। শখে খেলেও চলন্ত ফেরিতে সিগারেট খাওয়ার মজা সেও জানে!

দু’জনে দ্রুত নেমে সিগারেট কিনে নিয়ে এলাম। ফেরি ছেড়ে দেবার পর দুটো ধরালাম দু’জন। মজা করে টানছি।

‘কি ব্যাপার টিপু, ফেরি সরাসরি ওপারে যাচ্ছে কেন?’ অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

টিপু হেসে বললো, ‘ওপারেই তো মুন্সিগঞ্জ। ওই যে দেখেন ঘাট।’

‘আরে না, আহমেদ আতিক বললো না আধঘণ্টা লাগে? আমার মনে হয় ওই পারে মানুষ নামিয়ে তারপর ডানে বাঁক নেবে।’

আবারো হাসলো টিপু, ‘গাড়িগুলোর পজিশন উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে না তাহলে? ওটাই মুন্সিগঞ্জ।’

ফেরি ওপারের ঘাটে ভিড়তেই শুভঙ্কর আতিকের ফাঁকি বুঝতে পারলাম। কোথায় আধঘণ্টা আর কোথায় পাঁচমিনিট! ধরতে হবে ব্যাটাকে। অহেতুক কেন মিথ্যে বললো!

ঢালের পাশে খাঁচার উপর বিশাল বিশাল পাঙ্গাস নিয়ে বসে আছে মাছ বিক্রেতারা। থমকে দাঁড়ালো টিপু। মুন্সিগঞ্জে যে মাছ অনেক সস্তা জানে ও। এখানে বেড়াতে আসার প্রসঙ্গ তুলে অফিসে একদিন বলেছিলাম। হেসে টিপু জানালো, এখানে আজ বেড়াতে আসার আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বড়ো দেখে একটা মাছ কিনে নিয়ে যাওয়া। আগামী রোববার চট্টগ্রাম থেকে ওর মামাশ্বশুর বেড়াতে আসছেন ওদের বাসায়।

'ফিরে যাওয়ার সময় মাছ পাবো তো?'

বললাম, 'ঘাট তো, অবশ্যই পাওয়া যাবে। না পাওয়া গেলেও কিছু করার নেই। পাঙ্গাস কাঁধে নিয়ে শহরে ঘোরা সম্ভব নয়।'

ঢাল বেয়ে বড়ো রাস্তায় উঠে এলাম আমরা। কয়েকটা বাস দেখা গেলো। 'সিরাজদিখান! লৌহজং!' বলে চিৎকার করে যাত্রী ডাকছে হেলপাররা। অসংখ্য রিকশা আর মানুষের জটলা। ঢাকা শহর দূষিত করে দিয়ে আসা টেম্পোও দেখা যাচ্ছে দুটো। আহমেদ আতিক বলেছে, এখান থেকে মুন্সিগঞ্জ শহরে রিকশায় যাওয়া যায়। ভাড়া আটটাকা। কিন্তু রিকশাঅলাকে ঠিক কোন জায়গার কথা বলবো, কোথায় নামলে ভালো হয় বুঝতে পারছি না। নাকি টেম্পোতে উঠবো? কিন্তু টেম্পো কোথায় নামাবে? রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছি। মফস্বল থেকে ঢাকায় প্রথম আসা পাবলিকরা এ ধরনের সমস্যায় পড়ে। আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে ঠিক উল্টোটা। ঢাকা থেকে এ মফস্বল শহরে প্রথম এসে আবুল হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। শেষে বুদ্ধি করে পাশের দোকানটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'আসসালামু আ'লাইকুম।'

'ওয়া আ'লাইকুম আস সালাম।'

'ভাই, মুন্সিগঞ্জ শহরে যাবো। কিসে গেলে ভালো হয়? রিকশা না টেম্পো?'

'কই যাইবেন আপনেরা?'

'মুন্সিগঞ্জ শহরে।'

'শহরের কোন জায়গায় যাইবেন? কারো বাসায় নাকি মার্কেটে?'

'অ্যাঁ? মার্কেটে। শহরের মেইন জায়গায় যেতে চাচ্ছি।'

'রিকশায় সুপার মার্কেট নামবেন। দশ ট্যাকা নিবো ভাড়া।'

রিকশায় উঠে বললাম, 'দেখেন তো টিপু নেটওয়ার্ক আছে কিনা?'

পকেট থেকে মোবাইল বের করে টিপু বললো, 'আছে। তবে অল্প।'

মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। ইচ্ছে করে মোবাইলটা আজ বাসায় ফেলে এসেছি। কেন যে ফেলে এলাম! সঙ্গে থাকলে মাহিনের সঙ্গে এখন কথা বলা যেতো। যখনই ঢাকার বাইরে যাই মোবাইলে কথা হয় আমাদের। ঢাকা থেকে দূরে কোথাও গিয়ে ফোনে ওর সঙ্গে কথা বলতে কি যে ভালো লাগে! এ এক অন্য রকম আনন্দ। এ আনন্দ থেকে আজ বঞ্চিত হতে হচ্ছে। টিপুরটা মোবাইল টু মোবাইল। অতএব, কাজ হবে না।

ঠিক এ মুহূর্তে কি করছে মাহিন? আমার কথা ভাবছে? মেয়েটা জানেও না ওকে ছেড়ে কতো দূরে চলে এসেছি। খুব মনে পড়ছে ওর কথা। সারাটা পথ মনে পড়েছে। বাসে, ফেরিতে, সর্বত্র। মস্তিষ্কের কোষে কোষে যার বসবাস, তার কথা সবসময়ই মনে পড়ে। আলাদা সময় বের করে তার কথা ভাবতে হয় না। মোবাইল সঙ্গে নেই বলে ওর কথা এ মুহূর্তে বেশি করে মনে পড়ছে এই যা।

নদীর পাড় ঘেঁষে সোজা চলে গেছে রাস্তাটা। দ্রুত এগিয়ে চলেছে রিকশা। রাস্তায় তেমন আলো নেই। মাঝে মাঝে ল্যাম্প পোস্ট বসানো। ঝিঁঝিঁর ডাক ভেসে আসছে ক্রমাগত। ভেসে আসছে নদীর বিশুদ্ধ হাওয়া। ইস্,

টিপুর বদলে এ মুহূর্তে মাহিন যদি পাশে থাকতো!

ডান দিকে বাঁক নিয়েছে শীতলক্ষা। নদীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাস্তাটাও ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। একটু পরই তিন রাস্তার মোড়ে উঠে এলো আমাদের রিকশা। মোড় থেকে বিশাল চওড়া এক রাস্তা চলে গেছে হাতের ডানে। রাস্তার মাঝে আইল্যান্ড। সার বেঁধে দেবদারু গাছ লাগানো তাতে। রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য দোকানপাট, আধুনিক বিপণী, ব্যাংক, সরকারী অফিস। অবিকল ঢাকার মতো। বোঝা যাচ্ছে এটাই মুন্সিগঞ্জ শহরের 'মতিঝিল'। কিছুদিন আগে মাহিনও এ রাস্তা দিয়ে গেছে। মনে পড়তেই কেমন যেন এক বিচিত্র অনুভূতি হলো মনে।

চওড়া রাস্তাটা শেষ হবার পর আবার একটা মোড়। ডান দিকে বাঁক নিলো রিকশা। এ রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়। কিছুদূর এগিয়ে একটা মার্কেটের সামনে থেমে গেলো আমাদের রিকশা।

রিকশাঅলা বললো, 'এইডাই সুপার মার্কেট।'

নেমে ভাড়া মেটাতে মেটাতে বললাম, 'প্রতিদিন কেমন ইনকাম? পোষায় এখানে?'

'আসলেই পোষায় না।'

'কোত্থেকে আসছেন?'

'রংপুর।'

'কতোদিন আগে?'

'একমাস হইলো।'

'ঢাকায় চলে গেলেই পারেন। অনেক বেশি আয় করতে পারবেন।'

'সবচেয়ে ভালা চট্টগ্রাম। যামু গা। থাকুম না এহানে।'

সুপার মার্কেটে এসকেলেটরও আছে। অবাক হয়ে টিপু বললো, 'কারবার দেখেন।'

'জাপানী পয়সা। মুন্সিগঞ্জসহ বিক্রমপুরের কয়েক হাজার পোলাপান জাপানে কাজ করে।'

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হাতের ডানে ফেলে এগিয়ে চলেছি আমরা। দ্রুত হাঁটছি। যতোটুকু সম্ভব দেখে নিতে হবে শহরটা। প্রায় আটটা বাজে। বেশি হলে আর দু'ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করতে পারবো। তারপর ফিরতি পথ ধরতে হবে।

সামনে একটা মোড়। কোনদিকে যাবো বুঝতে পারছি না। শেষে বাঁয়ের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। রাস্তাটা অনেক চওড়া। তবে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। অনেক দূরে দূরে ল্যাম্প পোস্ট। লোকজন নেই রাস্তায়। গাড়িটাড়িও চোখে পড়ছে না। মাঝে মধ্যে দুয়েকটা রিকশা আসছে উল্টো দিক থেকে। রাস্তার ডানে অনেক ফাঁকে ফাঁকে দুয়েকটা দোকানপাটে বৈদ্যুতিক বাল্বের ম্লান আলো জ্বলছে। কেমন ভুতুড়ে একটা পরিবেশ। পরিবেশটা হয়তো ঠিকই আছে। ঢাকায় রাতে সবসময় রাস্তাঘাটে চোখ ধাঁধানো আলো দেখি বলে এমন লাগছে। গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি আমরা।

কিছুক্ষণ পর রাস্তার বাঁয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলা আদালত পড়লো। রাস্তার পাশেই বিশাল মাঠ, সবুজ ঘাসের গালিচায় ছাওয়া। তারপর সুদৃশ্য কিছু দালানকোঠা। ঝিরঝিরে মিষ্টি হাওয়া বইছে। মাঠে বসে বাতাস খাচ্ছে অনেকে, আড্ডা মারছে। কি চমৎকার মাঠ! ঢাকায় এমন মাঠ এখন আর চোখে পড়ে না। রাজনৈতিক ধান্ধাবাজরা ওসব মাঠ দখল করে অফিস বানিয়ে আখের গোছাচ্ছে। মাঠে বসার লোভ উপেক্ষা করে হাঁটতে লাগলাম আমরা।

একটু এগুনোর পর হাতের ডানে ছোট্ট একটা মার্কেট। রাস্তার সমান্তরালে আট-দশটা দোকান। এটাই

মার্কেট। আলো ঝলমল করছে দোকানগুলোয়। ফাস্টফুডের সুদৃশ্য দোকানও আছে একটা। গান বাজছে দোকানটায়। মার্কেটটার আগে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা।

ভেতরে অনেক গাছপালা দেখা যাচ্ছে। বড়ো গেইটটার দিকে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম আমি আর টিপু। কি এটা? গেইট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দাঁড়ালাম। গাঢ় অন্ধকার ভেতরে। ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু গাছপালা আর বড়ো বড়ো ঘাস দেখা যাচ্ছে রাস্তার আলোয়। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে ছোট্ট একটা লেখাও চোখে পড়লো।

'কবরস্থান এটা। চলেন চলে যাই,' বিজ্ঞের মতো বললো টিপু।

সন্দেহের সুরে বললাম, 'কবরস্থান তো এরকম থাকে না!'

'কেমন থাকে? ওই যে দেখেন কত্তো বড়ো বড়ো ঘাস।'

পায়ের দিকে তাকান। পাকা ফ্লোরটা দেখেন। সিঁড়ির মতো, তিনটা লেয়ার। কবরস্থানের গেইটে এমন ডিজাইন থাকে না। এটা কবরস্থান না, অন্য কিছু।'

'দুর মিয়া এটা কবরস্থানই।'

'ওই যে দেখেন রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা শেড দেখা যাচ্ছে।'

'কেন, কবরস্থানে কি শেড থাকতে পারে না?'

'চলেন ভেতরে গিয়ে নিশ্চিত হই।'

'এই অন্ধকারে ভেতরে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'একটু যাবো। ওই শেডটার কাছে চলেন।'

ডানের সরু পাকা রাস্তাটা ধরে দু'জনে এগুলাম। গা কেমন ছমছম করছে। এটা কি আসলে? কোথায় ঢুকে পড়েছি আমরা? অজানা কোনো বিপদ ওঁৎপেতে নেই তো?

কোনো রকম বিপদ-আপদ ছাড়াই শেডের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'চলেন আরেকটু ভেতরে যাই।'

রাস্তার দু'পাশে বড়ো বড়ো ঘাসের জঙ্গল, আগাছা। পা দিয়ে রাস্তায় শব্দ করে করে এগুচ্ছি আমরা। হাততালিও দিচ্ছি। সাপ-টাপ থাকলে সরে যাবে।

বিশাল একটা শেডের সামনে এসে দাঁড়ালাম। পাকা মেঝে। উল্টোদিকের দেয়ালে শিশুদের বড়ো বড়ো ছবি আঁকা। মুহূর্তে বুঝে গেলাম এটা আসলে মুন্সিগঞ্জ শিশু পার্ক! ছবিগুলো দেখিয়ে টিপুকে বললাম, 'ওই যে দেখেন আপনার কবরস্থান!'

লাজুক হাসলো টিপু। 'শিশু পার্কের এ অবস্থা!'

'যাক আপনার বৌ আর আমার হবু বৌ বিশ্রাম নিতে পারবে এখানে বসে। গেইটের পাশে খাবারের দোকানও আছে। কোনো সমস্যা হবে না।'

'হ্যাঁ, এখন আর ওদের নিয়ে আসতে সমস্যা নেই।'

আরেকটু এগুলাম আমরা। রাস্তার বাঁয়ে চরকির মতো দেখতে কি একটা রাইড অকেজো হয়ে পড়ে আছে। দেখে হেসে উঠলো টিপু, 'হ্যাঁ, এবার নিশ্চিত হওয়া গেলো এটা শিশু পার্ক।'

অন্ধকারে এখানে থাকা আর ঠিক না। মুন্সিগঞ্জ শিশু পার্ক থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। মুন্সিগঞ্জ শহরের কথা শোনার পর থেকেই মাহিনকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসার তীব্র একটা ইচ্ছে কাজ করছে মনে মনে। টিপুকে

বলেছিলাম ব্যাপারটা। টিপুও ভাবিকে নিয়ে আসতে আগ্রহী। কিন্তু মেয়েরা রোদের মধ্যে টো টো করে কতোক্ষণ ঘুরতে পারবে একটা শহরে? ভেবে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম আমরা। এখন আর সে সমস্যা নেই। ওদের বিশ্রাম নেবার জায়গা পাওয়া গেছে। ভেবে পুলক জেগে উঠলো মনে। ঢাকায় ওকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গিয়ে শান্তি পাই না। কেউ দেখে ফেলার প্রচণ্ড একটা ভয় তাড়া করে ফেরে সবসময়। কারা যেন দু'বার রিপোর্টও করেছে ওদের বাসায়। মহা ঝড় বয়ে গেছে বেচারির ওপর দিয়ে। কিন্তু এখানে পরিচিত কেউ নেই। কাজেই কেউ দেখে ফেলার ভয়ও নেই। প্রাণ ভরে ঘুরতে পারবো ওকে নিয়ে।

রাস্তা ধরে ফের হাঁটতে শুরু করেছি আমরা। সেই ছোট্ট মার্কেটটা পেছনে ফেলতেই রাস্তার আলো ধীরে ধীরে কমতে শুরু করলো। দূরে কোনো আলো চোখে পড়ছে না; শুধু আঁধার আর আঁধার। সেই আঁধার ভেদ করে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। হাঁটতে হাঁটতে একসময় ছোট্ট একটা কালভার্টের উপর উঠে এলাম। কালভার্টটা অনেক উঁচুতে। বাঁদিকে বিশাল এক কড়ই গাছ ডালপালা ছড়িয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। রেলিঙে হেলান দিতেই উল্টোদিকে কবরস্থান চোখে পড়লো।

মুচকে হেসে বললাম, 'টিপু, ওই যে আপনার কবরস্থান।'

টিপুও হাসলো।

'পানির বোতলটা বের করেন তো।'

ব্যাগ খুলে পানির বোতলটা বের করে আমার হাতে দিলো টিপু। এমনিতেই গরম। তার ওপর অনেকক্ষণ হেঁটেছি বলে প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু বোতলে পানি আছে সামান্য। তৃষ্ণা মিটিয়ে পানি খাওয়ার উপায় নেই। কয়েক ঢোক খেয়ে টিপুকে খেতে দিলাম। বাকি পানিটুকু খেয়ে ব্যাগে বোতল ভরে রাখতে রাখতে টিপু বললো, 'কোথাও থেকে বোতলটা ভরে নিতে হবে।'

'পেছনে একটা মসজিদ ফেলে এসেছি। ফেরার সময় ভরে নিলেই হবে। এখানে তো ডিপ টিউবওয়েলের পানি, তাই না?'

'হ্যাঁ। আরো সামনে যাবেন?'

'ঠিক হবে না। ন'টা বেজে গেছে। মূল শহরটা চক্কর দিয়ে সময়মতো ফেরি ধরতে হবে। তাছাড়া এদিকে তো অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

কালভার্টের নিচের কচুরিপানার দিকে তাকিয়ে টিপু বললো, 'কতো দূরে চলে এসেছি আমরা! আতিক ছাড়া কেউ জানে না। আমাদের মেরে নিচে ফেলে দিলে লাশও খুঁজে পাবে না কেউ।'

'দু'জন বিধবা হয়ে যাবে। ইট্টুসখানি কান্নাকাটি করবে। তারপর একবছর না ঘুরতেই বিয়ে।'

মৃদু হাসলো টিপু। কিছু বললো না।

সত্যিই ঢাকা ছেড়ে কতো দূর চলে এসেছি আমরা! অচেনা এক শহরের অচেনা স্থানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ জানে না এ মুহূর্তে আমরা কোথায় আছি, কেউ না! চুপচাপ কি যেন ভাবছে টিপু। ভাবির কথা ভাবছে? জানি না। আমি মাহিনের কথা ভাবছি। কি করছে ও এখন? মোবাইলে আমাকে না পেয়ে ওর ছোট্ট বারান্দাটায় মন খারাপ করে বসে আছে? নাকি দু'হাতে গ্রিল ধরে আনমনা হয়ে রাতের আকাশ দেখতে দেখতে আমার কথা ভাবছে?

আট

পুরো ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন। রাগে, দুঃখে, ভয়ে কান্না পাচ্ছে আমার। বলা নেই কওয়া নেই পাত্রপক্ষ এভাবে হুট করে আমাকে দেখতে চলে আসবে কল্পনাও করিনি। আমাদের বাসার কেউও বোধহয় কল্পনা করেনি। না করলেও তারা খুশি। পাত্রপক্ষ এতো আগ্রহ নিয়ে এভাবে চলে

আসায় আব্বু, ভাইয়া, ভাবির আনন্দের সীমা নেই। শুধু আম্মু একটুও খুশি হয়নি।

রাগে গজগজ করতে করতে আম্মু আব্বুকে বলেছে, ‘এসব কি?’

‘কোন সব?’

‘কোনো খবর-টবর না দিয়ে ওরা এভাবে চলে এসেছে কেন!’

‘পাত্রপক্ষ যেচে এসেছে এটা তো আমাদের জন্য খুশির খবর।’

‘মোটেও খুশির খবর না। আমার মেয়ে পানিতে পড়ে যায়নি যে, মানুষজন কোনো খবর না দিয়ে এভাবে হুট করে বাসায় চলে আসবে।’

অসহিষ্ণু কণ্ঠে আব্বু বললো, ‘আহ্হা ব্যাপারটা তুমি এভাবে দেখছো কেন!’

‘তো কিভাবে দেখবো? ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে। ওদের তুমি চলে যেতে বলো।’

‘আস্তে কথা বলো! শুনতে পাবে ওরা!’

‘শুনলে শুনুক। নাশতা বানাচ্ছি আমি। নাশতা খেয়ে যেন ওরা চলে যায়। আমার মেয়ে ওদের সামনে যাবে না।’

‘প্লিজ, ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করো!’ হঠাৎ করে রেগে গেলো আব্বু। ‘এসেই যখন পড়েছে মাহিনকে দেখে যাক না ক্ষতি কি? দেখা মানেই তো বিয়ে নয়।’

‘তোমার যা খুশি করো!’ বলে রান্নাঘরে ঢুকে গিয়েছিলো আম্মু।

পাত্রপক্ষের আমাকে দেখা-টেখা শেষ। নাশতা-টাশতা খাওয়াও শেষ। এ মুহূর্তে ড্রোইংরুমে আব্বু আর ভাইয়ার সঙ্গে গল্প করছে তারা। মাঝে মাঝে হাসির আওয়াজও ভেসে আসছে। হাসি শুনে রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে আমার। ভয়ও লাগছে। প্রচণ্ড ভয়। ওরা আমাকে পছন্দ করে ফেলেনি তো!

আমি আমার শোবারঘরে। দরোজা বন্ধ করে শুয়ে আছি। ড্রোইংরুমে গিয়ে মিনি ইন্টারভিউটা দিয়ে সোজা নিজের ঘরে এসে সেই যে দরোজা বন্ধ করেছি আর খুলিনি। ভীষণ কান্না পাচ্ছে। কতো বড়ো বিপদ আমার। অথচ এ বিপদে হাসিনের কোনো খবর নেই। কোথায় এ বিপদে টেলিফোনে আমাকে একটু সান্ত্বনা দেবে, সাহস দেবে, ভরসা দেবে তা না – হারামজাদাটার কোনো পাত্তাই নেই। পাত্রপক্ষ আসার পর থেকেই সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে কতোবার যে ওকে ফোন করার চেষ্টা করেছি! প্রতিবারই মোবাইল বন্ধ পেয়েছি। আমার এমন একটা বিপদের সময় মোবাইল কেন বন্ধ করে রেখেছে ও? প্রায়ই এ কাজটা করে। মোবাইল কিনেছে কি বন্ধ করে রাখার জন্য? বেশ কিছুদিন আগে ওটা বাসায় রেখে মুন্সিগঞ্জ শহরে গিয়েছিলো বেড়াতে। আজো কি ওটা বাসায় ফেলে রেখে কোথাও বেড়াতে গেছে? আমি এদিকে টেনশনে মরে যাচ্ছি আর ওদিকে উনি মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? ব্যাটাকে সামনে পেয়ে নিই একবার! খামচে যদি রক্ত বের করে না দিই তো ...!

এ প্রস্তাবটা এসেছিলো প্রায়চার মাস আগে। প্রস্তাব মানে বায়োডাটা। পাত্র লন্ডনে থাকে। ওখানেই সেটেলড। চার্টার অ্যাকাউনট্যান্ট। অনেক টাকা কামাই করে। কয়েক মাস পর দেশে এসে বিয়ে করে বৌ নিয়ে যাবে। এ ফাঁকে তার বাবা-মা, ভাই-বোন মেয়ে পছন্দ করে রাখবে। তাদের পছন্দ মানেই ছেলের পছন্দ। আহা, কি লক্ষ্মী সোনার চান আমার! লন্ডনে স্থায়ীভাবে বাস করলেও বাবা-মায়ের পছন্দের প্রতি কি ভক্তি! কি সম্মান! বায়োডাটা পেয়ে তো বাপজান আমার মহা খুশি টু দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি। ভাইয়া ভাবিও আনন্দে থই থই। শুধু আম্মু দ্বিধাগ্রস্ত। একমাত্র মেয়ে তার সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে থাকবে? মেয়েকে এক নজর চোখের দেখাও দেখতে পাবে না?

ফোনে হাসিনকে সব জানালাম। বরাবরের মতো অভয় দিলো ও আমাকে, বুদ্ধি দিলো। আর বললো, পাত্রের

বাসার ফোন নম্বরটা বায়োডাটা থেকে টুকলিফাই করে রাখতে। ব্যাটা দেশে এলে ফোন করে বিয়ের শখ মিটিয়ে দেবে।

তারপর হাসিনের বুদ্ধিমতো আম্মুকে একদিন বললাম, 'তোমার একমাত্র মেয়েটাকে সেই লন্ডনে পাঠিয়ে দেবে?'

আম্মু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

'এতো দূরে মেয়েকে রেখে তাকে না দেখে থাকতে পারবে তুমি?'

আম্মুর চোখে গাঢ় মমতা।

'তোমার একটুও খারাপ লাগবে না?'

'ঠিকমতো পড়াশোনা করগে যা। এ বিয়ে হবে না।'

কি যে আনন্দ লেগেছিলো আমার! কি যে আনন্দ! বুক থেকে যেন পাষাণ ভার নেমে গিয়েছিলো।

এর আগেও অনেক বায়োডাটা এসেছিলো। আব্বুর পাঞ্জাবির পকেটে থাকতো ওগুলো। লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকগুলো পড়েছি আর হেসেছি। কি যে সব ফিরিস্তি! চৌদ্দগোষ্ঠীর কে কি তার বিবরণ। পড়ে মনে হয় এমন পাত্র দেশে আর দ্বিতীয়টা হয় না। কিন্তু পাত্রদের ছবি দেখলেই ভয়ে বুক ধক করে ওঠে। একটার চেহারা ডাকাতের মতো তো আরেকটার চেহারা ক্যাডারের মতো।

কতো মানুষ যে আব্বুর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে আগ্রহী! বায়োডাটা নিয়ে হাজির হয় তারা আব্বুর কাছে। কোনো বায়োডাটা পছন্দ হয়ে গেলে ভাইয়া, ভাবি আর আম্মুকে নিয়ে ড্রোইংরুমে গিয়ে ঢোকে আব্বু। দরোজা বন্ধ করে পাত্রের গুণগত মান নিয়ে আলোচনা করে সবার সঙ্গে। তাদের গোপন শলাপরামর্শ দেখে ভয়ে কলজে শুকিয়ে যায় আমার। পড়তে ইচ্ছে করে না। অথচ সামনেই অনার্স সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল। সেকেন্ড ক্লাস পেতে হলে এ পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো করতে হবে আমাকে। ভাবিকে আম্মুকে অনেকবার আমার এ সমস্যার কথা বলেছি। তাদের বক্তব্য, আমরা তো তোমাকে একেবারে তুলে দিচ্ছি না। জাস্ট কাবিন হয়ে থাকবে। ফাইনাল পরীক্ষার পর ফাইনাল বিদায়। অতএব নিশ্চিন্তে তুমি তোমার পড়া পড়তে থাকো।

নিশ্চিন্তে পড়াশোনা! হাহ্! একেকটা বায়োডাটা আসে আর আমি যে কি আতঙ্কের মধ্যে থাকি তা কি ওরা কল্পনাও করতে পারবে? যদি কোনো পাত্রকে মনে ধরে যায় আব্বুর! তখন কি হবে আমার! হাসিনেরই বা কি হবে! ওকে ছাড়া দুনিয়ার কাউকেই স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারবো না আমি। তীব্র আতঙ্কে ভুগতে ভুগতে গোপনে তাঁর কাছে দু'হাত তুলি– হে একমাত্র ত্রাণকর্তা, তুমি আমাকে বাঁচাও!

তাঁর কি অসীম দয়া কাউকেই পছন্দ হয় না আব্বুর। এ ছেলের এ সমস্যা তো ওই ছেলের ওই সমস্যা। একমাত্র মেয়ের জন্য সবদিক দিয়ে নিখুঁত এক জামাই চান তিনি। মেয়ে যেন তার রাজকন্যা। মেয়ে যে তার শ্যামলা, সাধারণ– তা বেমালুম ভুলে গেছেন পিতাশ্রী। সব তাঁর ইশারা! সব!

সে যা হোক, যেটাই হোক, লন্ডনি পাত্রের ভয়টা কেটে গিয়েছিলো আম্মুর প্রতিশ্রুতি পেয়ে। তাছাড়া পাত্রের তো দেশে আসতে অনেক দেরি আছে। তার বাবা-মা আমাকে এখনো দেখতে আসেননি। কবে আসবেন কে জানে। আর আম্মু যদি আব্বুকে ম্যানেজ করে ওদের মানা করে দেয় তাহলে তো কথাই নেই। এসব ভেবে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ছিলাম।

কিন্তু কোনো খবর না দিয়ে আজ বিকেলে হঠাৎ পাত্রের বাবা-মা আর বোন আমাদের বাসায় এসে হাজির। আব্বু-ভাইয়া-ভাবি খুশিতে আটখানা। আম্মুর মেজাজ খারাপ। আমার মন খারাপ। প্রচণ্ড ভয়ে কেমন অবশ হয়ে নিজের ঘরে শুয়েছিলাম। চোখে পানি এসে যাচ্ছিলো বারবার। উঠে তৈরি হয়ে নেবার জন্য ভাবি দু'বার তাড়া দিয়ে গেছে। পাত্তা না দিয়ে শুয়েই ছিলাম চুপচাপ। একটা কথাও বলিনি। অসহ্য লাগছিলো ওকে।

হঠাৎ আব্বু ঢুকলো ঘরে। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, ‘কি হলো, এখনো রেডি হোসনি কেন? তাড়াতাড়ি রেডি হ। মেহমানরা অপেক্ষা করছে।’ বলেই বেরিয়ে গেলো।

আব্বুর রাগী চেহারা দেখে কি দিয়ে যে কি হয়ে গেলো আমার! নিজের অজান্তেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ঘোরলাগা মানুষের মতো দরোজা বন্ধ করে কাপড় পাল্টাতে শুরু করলাম। আব্বুর ভয়ে ঘোর লাগলেও সেন্স কাজ করছিলো। হাসিনের পরামর্শমতো ওই সাদা ড্রেসটা পরলাম। এ ড্রেসটা পরলে নাকি খুব বাজে লাগে আমাকে। বদটা বুদ্ধি দিয়ে বলেছে, ‘লন্ডন বাহিনী তোকে দেখতে এলে ওটা পরে সামনে যাবি। পছন্দ করবে না তোকে।’ শুধু পোশাক পাল্টালাম। আর কিছু না। মুখে একটু প্রসাধনী না। এমনকি চুলটাও আঁচড়ালাম না। আয়নায় তাকালাম– অ্যাহ্ নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না নিজেকে!

দরোজা খুলে দেবার পর আমাকে দেখে বিরক্ত হয়ে ভাবি বললো, ‘একি, চুলটাও দেখি আঁচড়াওনি!’

‘লাগবে না, চলো।’

‘একদম ফালতু কথা বলবে না!’ বলে একরকম জোর করে আমার চুল আঁচড়ে দিলো মহিলা।

‘ওড়নাটা ঘোমটার মতো করে মাথায় দাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। চলো। ড্রোইংরুমে ঢুকেই সালাম দেবে সবাইকে।’

ড্রোইংরুমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভীষণ কান্না পাচ্ছিলো। বলির পাঁঠা মনে হচ্ছিলো নিজেকে– বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে চিৎকার করে হাসিনকে ডাকছিলাম– তুই কোথায়! আমার এতো বড়ো বিপদে তুই কোথায়! এই যে দেখ আমাকে ওরা দেখতে এসেছে। পছন্দ হলে বৌ করে নিয়ে যাবে। আমি পরের ঘরে চলে গেলে তোকে সেই নদীর তীরে, সেই লঞ্চঘাটে কে নিয়ে যাবে? তুই কোথায়! তুই কোথায়!

জীবনে এই প্রথম পাত্রপক্ষের সামনে যাচ্ছি। সব হারানোর ভয় ছাড়াও কেমন আড়ষ্ট লাগছিলো। পা চলতে চাইছিলো না। ভেতরে ঢুকে ছোট্ট করে সালাম দিলাম। এক ঝলকে দেখে নিয়েছি পাত্রের বাবা-মা আর বোনকে। বোনটা আল্ট্রা মডার্ন টাইপের। গর্দান পর্যন্ত ছাঁটা চুল।

পাত্রের বাবা বললেন, ‘বসো মা।’

ভাবি আমাকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিলো। মাথা নিচু করে বসে আছি আর মনে মনে তাকে ডাকছি। তাঁর দয়া না হলে হাসিনকে ঘিরে আমার সব সুখ-কল্পনা ধুলোয় মিশে যাবে।

কেউ কিছু বলছে না। সবাই চুপ। মাথা নিচু করে বসে থাকলেও স্পষ্ট বুঝতে পারছি তিনজোড়া চোখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আমাকে। আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। কি যে জঘন্য অস্বস্তি!

যেনবা যুগ যুগ পর পাত্রের বোন বললো, ‘কি নাম তোমার?’

‘মাহিন।’

‘ঠিক আছে তুমি যাও!’

আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলাম। তারপর ধীরপায়ে দরোজার দিকে এগোলাম। ভাবি আমার সঙ্গে। আস্তে করে আমার পিঠে হাত দিলো সে। যেনবা আমি ল্যাংড়া! না ধরলে পড়ে যেতে পারি! হঠাৎ এমন রাগ লেগেছিলো! স্থান-কাল-পাত্র ভুলে ঝটকা মেরে পিঠ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়েছিলাম।

সেই যে এসে নিজের ঘরে ঢুকেছি আর বেরোইনি। একটু আগে বিদায় নিয়েছে পাত্রপক্ষ। তাদেরকে সৌজন্যের চরম পরকাষ্ঠা দেখিয়েছে আমার আব্বু। ড্রাইভার রাসেদ ভাইকে পাঠিয়েছে তাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতে। খুব স্বাভাবিক। লন্ডনি পাত্রের বাবা-মা আর বোন বলে কথা!

হঠাৎ ঝনঝন শব্দে বেজে উঠলো আমাদের টেলিফোনটা। চমকে উঠলাম। ওর ফোন না তো! রিসিভ করার

জন্য লাফিয়ে উঠে দৌড় দিলাম। দরোজার কাছে পৌঁছে দেখি রিসিভার তুলে ফেলেছে আব্বু।

'ওয়ালাইকুম আসসালাম। কে বলছেন? ... না ... রাসেদ তো গাড়ি নিয়ে বাইরে গেছে। ... ঠিক আছে বলবো।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো আব্বু।

দরোজা বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। রাত নেমে গেছে অনেক আগেই। শ্রাবণের শেষদিক হলেও বৃষ্টি হচ্ছে না কয়েক দিন ধরে। তবে আকাশ আজ খুব মেঘলা। আবহাওয়া গুমোট। বৃষ্টি শুরু হতে পারে যে কোনো সময়। হাসিন তুই কোথায়? আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ কি মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামবে যে কোনো সময়। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আয়। বৃষ্টিতে একটু ভিজলেই তোর তো আবার ঠাণ্ডা লাগে। তোর দুটো পায়ে পড়ি তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আয়!

নয়

আমার অফিস দুপুর থেকে। কিন্তু যেদিন মন খারাপ থাকে সকাল সকাল অফিসে চলে যাই। আড্ডা দেই না। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলি না। সমস্যায় না পড়লে টেবিল ছেড়েই উঠি না। একমনে কাজ করে যাই। কাজ শেষ করে বিকেলে সোজা বাসায় চলে আসি। একটু বিশ্রাম নিয়ে, খেয়ে নিজের ঘরের দরোজা বন্ধ করে দিই। জানালাটা খোলাই থাকে। জানালার মাঝামাঝি পর্যন্ত পর্দা টেনে দিই, পুরোটা না। এর ফলে ঘরে একটা আলো-আঁধারী ভাব চলে আসে। সন্ধ্যে যতো ঘনিয়ে আসে আঁধার ততো গাঢ় হতে থাকে ঘরে। সন্ধ্যের পর জানালার উল্টোদিকের বাড়িটা থেকে হালকা আলোর আভা আসে। আলো-আঁধারী পরিবেশটা সবচেয়ে চমৎকার লাগে তখন। কেমন অপার্থিব মনে হয়। অপার্থিব ওই পরিবেশে চুপচাপ শুয়ে থাকি। শুয়ে শুয়ে আমার প্রিয় মায়াবতী মুখটার কথা ভাবি। মনে মনে ওর সঙ্গে কতো কথা যে বলি! ওকে আমার পাশে অনুভব করি; যেনবা আমাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে! আলো-আঁধারের পটভূমিতে ভেসে বেড়ায় প্রিয় মায়াবতী মুখ।

আজ আমার মন খারাপ। তাই এগারোটার দিকে অফিসে চলে গিয়েছিলাম। বাসায় ফিরে এসেছি বিকেলে। এখন সন্ধ্যা। আলো-আঁধারী পরিবেশে চুপচাপ শুয়ে আছি আমার ঘরে। ভাবছি।

বেচারি মাহিনের ওপর দিয়ে কি ঝড়টাই না গেছে গতকাল বিকেলে! অথচ তখন আমি রাজেন্দ্রপুরে আমিনুলের সঙ্গে মজা করে ঘুরছি! হাঁটছি, সিগারেট খাচ্ছি, গল্প করছি, বিকেলের অদ্ভুত সুন্দর আলোয় প্রকৃতি দেখছি। আর ওদিকে পাত্রপক্ষ মাহিনকে দেখছে!

আজ সকালে ফোন করে সব জানিয়েছে ও আমাকে। শুনে আতঙ্কে হিম হয়ে গিয়েছিলো বুকের ভেতরটা।

'ওরা তোকে পছন্দ করেছে?'

'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না!'

'তোকে না বলেছি ওই ড্রেসটা পরে সামনে যেতে?'

হাসলো ও। 'ওটা পরেই তো গিয়েছিলাম।'

'ফাইন। তাহলে তো পছন্দ করার কথা না। ওই ড্রেসটায় কি যে ফালতু লাগে তোকে!'

'লাগলেই ভালো।'

'ছেলের কে কে এসেছিলো?'

'বাবা, মা আর বোন।'

'কি কি জিজ্ঞেস করলো?'

‘শুধু জিজ্ঞেস করলো তোমার নাম কি?’

‘কে জিজ্ঞেস করলো?’

‘বোন।’

‘আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না?’

‘না। বললো ঠিক আছে তুমি যাও।’

‘আশ্চর্য! কেইস তো বুঝতে পারছি না রে!’

‘আমিও বুঝতে পারছি না। খুব ভয় লাগছে আমার! যদি ওরা পছন্দ করে ফেলে?’

‘আরে দুর! পছন্দ করে ফেললেও সমস্যা নেই। ছেলে দেশে আসতে আসতে আরো তিনমাস। তুই শুধু বায়োডাটা থেকে ফোন নম্বরটা কালেক্ট করে রাখবি।’

‘কি হবে তাতে?’

‘ফোনে ছেলেকে যা বলার বলবো। লেজ তুলে পালাবে শালা।’

‘যদি বাসায় সব বলে দেয়?’

‘হ্যাঁ... এটা অবশ্য একটা সমস্যা। তবে মনে হয় না বলবে। অনুরোধ করবো। বুঝিয়ে বলবো।’

‘কি বলবি?’

‘ধর ... বলবো ... ভাই, আপনি বলে দিন পাত্রী আপনার পছন্দ হয়নি। দয়া করে আসল ঘটনা ফাঁস করবেন না। আপনি কি চান আপনার জন্য একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হোক?’

হেসে মাহিন বললো, ‘আমি অবশ্য আগেই বায়োডাটা থেকে ফোন নাম্বারটা নিয়ে নিয়েছি।’

‘গুড! অতএব নো টেনশন ডু ফুর্তি।’

‘কিন্তু ওরা যদি পছন্দ করে ফেলে? বাবা-মা-বোনের পছন্দই নাকি ছেলের পছন্দ।’

‘তাতে কি? ফোন করে পছন্দকে অপছন্দ বানিয়ে দেবো।’

‘তুই বুঝতে পারছিস না। ধর ওরা ছেলেকে জানিয়ে দিলো মেয়ে ওদের পছন্দ হয়েছে। ছেলে কথাবার্তা ফাইনাল করতে বলে দিলো। তখন?’

‘তখন কি?’

‘তুই বুঝতে পারছিস না কেন? তখন আমাদের সবাই বলবে না কথাবার্তা ফাইনাল করে এখন পিছিয়ে যাচ্ছে কেন? তখন দোষ এড়াতে ছেলে আসল ঘটনা বলে দিলে?’

শুনে গুম মেরে গিয়েছিলাম ক’মুহূর্তের জন্য। অকাট্য যুক্তি। তবে দুশ্চিন্তায় ফেলিনি ওকে। বুঝিয়েছি। সমস্যা মোকাবিলার কথা বলেছি। সাহস যুগিয়েছি। এমনিতেই ভীষণ বৈরী একটা পরিবেশে বাস করছে বেচারি। এমন একজন মানুষ নেই যে ওর হয়ে কথা বলবে। কাজেই খামোকা ওর দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে লাভটা কি?

ইস্, গতকাল বিকেলটা কি টেনশনেই না কেটেছে ওর! টেনশনটা কারো সঙ্গে একটু শেয়ারও করতে পারেনি। আমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে কিছুটা হলেও অভয় পেতো। অসহায়ের মতো ফোনে কতোবার ট্রাই করেছে আমাকে। না, গতকাল মুন্সিগঞ্জের মতো মোবাইল বাসায় ফেলে রাজেন্দ্রপুর যাইনি। সঙ্গেই ছিলো। কিন্তু নেটওয়ার্ক ছিলো না ওখানে। আমার লাইনটার এই এক সমস্যা। ঢাকার বাইরে তেমন একটা নেটওয়ার্ক

নেই। শুধু দক্ষিণে, অর্থাৎ কক্সবাজার পর্যন্ত আছে।

আলো জ্বলে উঠেছে পাশের বাড়িটায়। জানালা দিয়ে আভা আসছে। খুব সুন্দর একটা পরিবেশ। এ পরিবেশে চুপচাপ শুয়ে থেকে প্রিয় কারো কথা ভাবতে ভালো লাগে। আমার ভালো লাগছে না। কষ্ট হচ্ছে। ভয় লাগছে। মাহিনকে দেখানো পর্ব শুরু হয়ে গেছে। সামনে আবারো দেখানো হবে। একের পর এক প্রস্তাব আসতে থাকবে– বাছাই করে দেখানো পর্বও চলতে থাকবে। ক'জন পাত্রকে ঠেকাবো আমি! একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করবো? ওদের বাসায় প্রস্তাব পাঠানো মানে ওর বিয়েটাকে আরো এগিয়ে দেয়া। আমার এমন কোনো স্পেশাল যোগ্যতা নেই যা শুনে আনন্দে বিগলিত হয়ে যাবেন মাহিনের বাবা-মা। তাছাড়া ও আমাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'আব্বু যদি কোনোরকমে টের পায় তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে তাহলে কেয়ামত হয়ে গেলেও রাজি হবে না।'

পরিস্থিতি যেখানে এরকম সেখানে কিইবা করার আছে আমার? একটাই করার আছে– টাইম পাস করা। এ ফাঁকে অনার্সটা শেষ করুক ও। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে ঘুরে দাঁড়াবে ও। আমার হয়ে সবার সঙ্গে লড়বে। বোঝাবে। অনুনয় করবে।

রাজেন্দ্রপুর জায়গাটা চমৎকার। শ্রীপুরের একটু আগে। ঢাকা-শ্রীপুর মহাসড়কের ডান দিক দিয়ে বাঁক খেয়ে সোজা ভেতর দিকে চলে গেছে চওড়া একটা রাস্তা। দু'পাশে গজারি বন। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়েছি আমি আর আমিনুল। ইচ্ছে করেই। অদ্ভুত একরকম ঝিঁঝিঁ পোকা আছে ওখানে। ভীষণ জোরে ডাকে। থেমে থেমে। শুনলে মনে হয় পাখি বা অন্য কিছুর ডাক। চওড়া রাস্তার মাথায় ডানদিকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। তারপর রেললাইন। ওপারে জনবসতি। খুব ভালো লাগছিলো। মাহিনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো। ইচ্ছে থাকলে নাকি উপায় হয়। ভুয়া কথা। নেটওয়ার্ক না থাকলে উপায় হবে কি করে!

রাতে ফিরতি পথ ধরেছিলাম। আকাশে ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ। চওড়া রাস্তার দু'পাশে গজারি বন। মন মাতাল করা চমৎকার বাতাস। রিকশা তো নয় যেন পঙ্খীরাজে চড়ে যাচ্ছিলাম আমরা। কি যে ভালো লাগছিলো! কি যে মনে পড়ছিলো মাহিনের কথা! আহ্, ও যদি এখন পাশে থাকতো!

দশ

ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরছে। শ্রাবণ মাসের শেষদিক এখন। প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। এখন মাঝরাত। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম বৃষ্টি পড়ছে। মুহূর্তে ঘুম ঘুম ভাব উধাও হয়ে গেলো দু'চোখ থেকে। বিছানা থেকে নেমে দরোজা খুলে বারান্দায় চলে এসেছি।

ভিজতে ইচ্ছে করছে খুব। কিন্তু আজ সেদিন রাতের মতো সে সুযোগ নেই। হাওয়া বইছে না। ফলে ঝাপটা নেই। আস্তে আস্তে ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে। মানুষের মন ভালো না থাকলে কখনোই বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করবে না। বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করে তখন যখন মন ভালো থাকে। আজ আমার মন ভালো। খুব ভালো। বিয়ের বিপদটা আপাতত কেটে গেছে। লন্ডনি পাত্রের বাবা-মা আর গর্দান ছাঁট বোন সম্ভবত পছন্দ করেনি আমাকে। আজ বিকেলে ড্রোইংরুমে বসে আব্বু আর ভাইয়া আলাপ করছিলো এ ব্যাপারে। আড়াল থেকে সব শুনেছি।

আব্বু বলছিলো, 'এক সপ্তাহ হয়ে গেলো ওরা কিছু জানালো না। ব্যাপারটা কি রে?'

গম্ভীর কণ্ঠে ভাইয়া বলেছে, 'মাহিনকে সম্ভবত পছন্দ হয়নি ওদের।'

'পছন্দ হোক আর না হোক একটা খবর তো পাঠাবে, নাকি?'

'আপনি সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না কেন! কোনো খবর না পাঠানো মানেই তো খবর। এর অর্থ– পাত্রী পছন্দ হয়নি আমাদের।'

শুনে খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছিলো আমার। পাত্রপক্ষ পছন্দ করেছে শুনলে মেয়েরা খুশি হয়। আর আমি খুশি

হয়েছি পছন্দ করেনি শুনে। পছন্দ করেনি শুনে দরোজা বন্ধ করে মেয়েরা কাঁদে। আর আমার আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করেছে। অদ্ভুত এ ঘটনার মূলে ওই শয়তানটা, ওই বদমাশটা।

আচ্ছা, এ মুহূর্তে কি করছে ও? সেদিন রাতের মতো বৃষ্টি দেখছে? নাকি ঘুমে বেহুঁশ? আজ রাতেই ফোনে খুশির খবরটা জানিয়েছি ওকে। শুনে ফাজিলটা বলেছে, 'ওই ড্রেসটাকে তাড়াতাড়ি কদমবুসি কর! তারপর আলমারিতে যত্ন করে রেখে দে। শালারা তোকে দেখতে এলেই এটা পরে সামনে যাবি। ব্যাস, বিয়ের হাউস মিটে যাবে শালাদের।'

আমিও সত্যি সত্যি ড্রেসটা ধুয়ে ইস্ত্রি করে আলমারিতে তুলে রেখেছি। আবার কবে কোন পার্টি হাজির হয় বলা তো যায় না।

হাসিনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে খুব। আমার একটা মোবাইল থাকলে কি যে সুবিধে হতো! এই যেমন এখন। মিসকল দিলেই চলতো। ও ফোন করতো। আজকাল অনেক মেয়ের হাতেই মোবাইল দেখি। রিকশায়, গাড়িতে বসে পুটুর পুটুর করে কথা বলে। ফোনে খবর দিয়ে জায়গামতো গিয়ে দেখা করে প্রিয় মানুষের সঙ্গে। কত্তো সুবিধে। আমার সে সুযোগ নেই। মোবাইল কিনে দিতে বললে বাসার সবাই বোয়াল মাছের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে; এমন ভাব করবে যেন পিস্তল কিনে দিতে বলেছি।

সামান্য একটা মোবাইল ফোনের অভাবে মাঝে মাঝে কি যে সমস্যায় পড়তে হয় হাসিনকে ফোন করতে! ভাইয়া, আব্বু বাসায় থাকলে জরুরি প্রয়োজনেও অনেক সময় ফোন করতে পারি না ওকে। মন খারাপ থাকলে ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে খুব। ভাইয়া, আব্বুর কারণে এক্ষেত্রেও অনেক সময় সমস্যা হয়। কর্ডলেস হাতে নিয়ে বসে থাকে। ফোন করার উপায় থাকে না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মন আরো খারাপ হয়ে যায়।

তাই অনেক সময় স্যারের বাসা বা কলেজ থেকে ফেরার পথে পে ফোন থেকে কথা বলি ওর সঙ্গে। একটা দোকান থেকেই করি সবসময়। চিঠিও পোস্ট করি ওখান থেকে। কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্ট ওরা। দোকানটা আমাদের মহল্লাতেই। কিছুদিন আগে ওই দোকানে ফোন করতে ঢুকে কি যে একটা লজ্জা পেয়েছি!

সেদিন প্রাইভেট পড়ে স্যারের বাসার সামনে থেকে রিকশায় উঠলাম বিকেল পাঁচটায়। টার্গেট হচ্ছে সেই দোকান যেখান থেকে চিঠি পোস্ট করি, ফোন করি। ভাবলাম, যদি বাসায় ভাইয়া থাকে তো হাসিনকে অফিসে ফোন করতে পারবো না। তখনো মোবাইল কেনেনি ও। তাই যেভাবে হোক বাইরে থেকে করতেই হবে। মাঝে মাঝেই এরকম হয়। মাথায় ভূত চেপে যায়। দেখা যায় যে, সকালেই একবার কথা বলেছি কিন্তু কিছুটা সময় গেলেই মনে হয়– আজ আবার কথা বলতেই হবে। ভাবির সঙ্গে একবার বারডেমে গিয়েছিলাম। তাকে বসিয়ে রেখে শাহবাগে চলে গিয়েছিলাম হাসিনকে ফোন করার জন্য! ভাবি জিজ্ঞেস করেছিলো, 'কোথায় যাচ্ছিস?' বলেছি, 'ফটোস্ট্যাট করতে।' Instant মিথ্যা কথা, কতো বড়ো বদ আমি!

তো সেদিন যখন ঘড়িতে দেখলাম মৌচাকেই পাঁচটা পনেরো বেজে গেছে, হার্টবিট বেড়ে গেলো। মনে মনে সমানে বলছিলাম, 'আল্লাহ্, যেন জ্যাম না থাকে, যেন হাসিনটা অপেক্ষা করে।' পাঁচটা বিশে দোকানটায় পৌঁছে গেলাম। প্রথমবার ওদের অফিসের PABX-এর লাইনটাই ব্যস্ত। হার্টবিট তখন তবলা বাজাচ্ছে। পাঁচটা বাইশ, আল্লাহ্‌র কি রহমত লাইন পেয়ে গেলাম, হাসিনও ওর চেয়ারেই বসে আছে, Yes...! আমার হাত-পা তখন সমানে ঠকাস ঠকাস করে কাঁপছে! ও যখন হেলেদুলে এসে অদ্ভুত সুরে হ্যালো বললো আমার তখন মনে হচ্ছিলো যেন ঝিরঝির বৃষ্টিতে আমার গায়ের উপর পিচ্চি পিচ্চি নরম শিল পড়ছে! আর হ্যাঁ, এটা আমার খুব প্রিয় একটা ইচ্ছা!

ফোনের লাইনটা কেটে দিয়ে রিসিভারটা জায়গামতো রাখার সময় ওটা ঠাশ করে হাত থেকে পড়ে গেলো। হাত থেকে ছুটে গিয়ে দোলা শুরু করলো। ফোনের ব্যাটা হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো আমার দিকে। ইস্, কি যে একটা লজ্জা পেয়েছিলাম সেদিন!

হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে সেই সঙ্গে। আসুক, বৃষ্টি আরো জোরে আসুক! সেদিন রাতের মতো মজা করে ভিজতে পারবো তাহলে। অথচ আম্মু বা বাসার কেউ টেরটিও পাবে না! কি মজা! সেদিন রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেজার কথা ফোনে জানিয়েছিলাম হাসিনকে।

শুনে ফাজিলটা বলেছে, 'আচ্ছা, বিয়ের পর আমি শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেলে আমাকে কোন ঘরে থাকতে দেবে রে?'

'গোয়ালঘরে।'

'কি বললি! খবরদার বাজে কথা বলবি না!'

'আরে রাগ করছিস কেন? গরুকে তো গোয়ালঘরেই রাখা হয়।'

'তার মানে বলতে চাচ্ছিস আমি গরু?'

'ইয়েস।'

'ঠিক আছে আমি গরু। কিন্তু তুই কি, জানিস? তুই হচ্ছিস মহিলা গরু।'

শুনে আর হাসি চেপে রাখতে পারিনি। খিলখিল করে হেসে ফেলেছিলাম।

'বল না কোন ঘরে থাকতে দেবে আমাকে?'

'কোন ঘরে আবার, গাধা! আমার ঘরে।'

'হ্যাঁ, ঠিক। তখন খুব মজা হবে।'

'কি মজা হবে?'

'বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'জন একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে পারবো। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ভিজতে থাকবো... ভিজতেই থাকবো।'

শুনে কি এক প্রবল ভালোলাগায় কেঁপে উঠেছিলাম।

ফাজিলটার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে ইচ্ছে করছে খুব। কি যে ভালো লাগে ওর সঙ্গে কথা বলতে! অদ্ভুত একটা আনন্দে ভরে থাকে মন। সারারাত কথা বলতে পারবো ওর সঙ্গে। একটুও ক্লান্ত হবো না। উল্টো ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। ওর সঙ্গে কথা বলাটা আমার জন্য মেডিসিন হিসেবে কাজ করে আসলে।

গত কুরবানি ঈদে বাড়িতে যাওয়ার সময় খুব ভেজাল হয়েছে। সবাই মিলে গাড়িতে করে গিয়েছিলাম। তবু চারঘণ্টার রাস্তা পাড়ি দিতে সময় লেগেছে বারোঘণ্টা! যা হোক দুপুরের পর থেকে শুরু হলো মাথাব্যথা। বাড়ছে তো বাড়ছেই, বাড়ছে তো বাড়ছেই! দিলাম চোখের কল খুলে। কেউ দেখেনি মামাতো বোন কেয়া ছাড়া। দাউদকান্দির এপারে ভয়াবহ জ্যামে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো আটকে আছে আমাদের গাড়ি। একসময় দেখি কাকা আর আব্বু গাড়ি থেকে নেমে গেলো। কাঁহা? পিসু করতে। হি হি ..।

আমার ব্যাগে বাসার মোবাইলটা ছিলো। বাসা থেকে দূরে কোথাও গেলে বাসার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাছাড়া সবসময় আলমারিতে থাকে ওটা। তো করবো কি করবো না করতে করতে হঠাৎ হাসিনকে ফোন করে বসলাম। ও তখন গরু কিনে মাত্র বাসায় ফিরেছে। বেশি হলে দেড়মিনিট কথা হয়েছে ওর সঙ্গে। হঠাৎ করে আব্বুকে গাড়ির দিকে ফিরে আসতে দেখে লাইন কেটে দিয়েছিলাম। মাত্র দেড় মিনিট! কিন্তু তারপর থেকে ধীরে ধীরে মাথার ব্যথাটা চলে যেতে লাগলো! এরপর আরো কতো জ্যাম গেলো, কতো কাহিনী হলো অথচ আমি তখন হাওয়ায় উড়ছিলাম!

হাসিন সেদিন রাতে আবারো ওই স্বপ্নটা দেখেছে। সেই নদীর স্বপ্ন। সেই লঞ্চঘাটের স্বপ্ন। এবার নিয়ে

কতোবার দেখলো কে জানে! যতোবারই দেখুক আর কোনোদিন এ স্বপ্নটা ও দেখবে না। আমি দেখতে দেবো না। সেই নদী আর সেই লঞ্চঘাটে ওকে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। খুব শিগগিরি ওকে ওখানে নিয়ে যাবো আমি। স্বপ্নের সেই দৃশ্যাবলী বাস্তবে দেখবে ও। দেখবে সাদা ডানায় রোদের ঝিলিক তুলে উড়ে বেড়াচ্ছে গাঙচিলেরা। বাস্তবে এসব দেখার পর আর কোনোদিনও এ স্বপ্নটা দেখবে না; দেখে কষ্ট পাবে না। অনেক হয়েছে, আর না। ওকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

এগারো

মাটির রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূর, বহুদূর। দু'ধারে সবুজ ফসলের মাঠ, আদিগন্ত বিস্তৃত। সাগরের বুকে ভেসে থাকা দ্বীপের মতো বাড়িঘর মাঝে মাঝে; ছবির মতো সুন্দর। কাঁচাসোনা মিষ্টি রোদে গা ভাসিয়ে কেমন ঝিম মেরে আছে প্রকৃতি। ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে। সে হাওয়ায় মাহিনের খোলা চুল এলোমেলো উড়ছে। উচ্ছল কিশোরীর মতো অনবরত কথা বলছে ও। ওর দু'চোখ জুড়ে মুগ্ধতা। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে দু'চোখ ভরে দেখছি ওকে। আহ্, কি যে ভালো লাগছে! কি যে ভালো লাগছে আমার! পথচারীরা কৌতূহলী দেখছে আমাদের। দেখছে ফসলের মাঠে কাজ করতে থাকা কিষান-কিষানীরা।

থমকে দাঁড়ালাম হঠাৎ। শিরশির করে উঠলো পুরো শরীর; লোম দাঁড়িয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই তো সেই রাস্তা! ওই তো সেই ফসলের মাঠ! ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে! মাহিনের খোলা চুলও তো উড়ছে! হ্যাঁ, এই তো সেই দশ্যপট! বারবার স্বপ্নে দেখা সেই দৃশ্যপট! আবারো সড়সড় করে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেলো আমার। স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মতো ফের পা চালালাম দ্রুত।

'অ্যাই, তুই অমন ঘোড়ার মতো হাঁটছিস কেন! একটু আস্তে হাঁট না!' হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎ বিরক্ত স্বরে বললো মাহিন।

থমকে দাঁড়ালাম। উপমা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে আছে! ঠিক এ কথাটাই বলেছিলো ও স্বপ্নে!

'কি রে এভাবে হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? মুখ বন্ধ কর। মাছি ঢুকবে তো!'

নিজেকে সামলে কপট রাগের ভঙ্গিতে বললাম, 'তুই আমাকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করলি কেন!'

ফিক করে হেসে ফেললো ও। 'না... মানে বলছিলাম অতো জোরে হাঁটছিস কেন? তোর সাথে তাল মেলাতে গিয়ে পা ব্যথা হয়ে গেছে আমার।'

আহ্, কি সুন্দর করে হাসে এ মেয়েটা! হাসি দেখলে কলজে ছ্যাঁদা হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত, এ মেয়ে যদি আমার কলজে বরাবর ছুরি চালিয়ে দিয়ে এমনি করে একটু হাসে– একটুও ব্যথা পাবো না।

এ পর্যন্ত ভেবেই আবারো চমকে উঠলাম ভীষণ। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়ছে– ওর অদ্ভুত মিষ্টি হাসি দেখে স্বপ্নে আমি প্রতিবার ঠিক এ কথাটাই ভাবি!

ভুরু কুঁচকে মাহিন বললো, 'কি রে কি ভাবছিস তুই!'

না, এখনই কিছু বলবো না এ মেয়েকে। আরো সামনে কি বিস্ময় অপেক্ষা করছে আমার জন্য দেখতে হবে আগে। দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত এ রহস্যময়ী মেয়েটা আমাকে কোথায় নিয়ে যায়। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'আমি ঘোড়ার মতো হাঁটি, না? আমি ঘোড়া হলে তুই কি? তুই তো মাদি ঘোড়া!'

'দ্যাখ!' দু'কোমরে দু'হাত রেখে কৃত্রিম রাগে ফুঁসে উঠলো মাহিন, 'অসভ্যের মতো কথা বলবি না! আমি মাদি ঘোড়া, না?'

স্বপ্নে যেভাবে বলেছিলো, হুবহু সেভাবে কথাটা বললো ও! ঠিক সেভাবে দু'কোমরে দু'হাত রেখে বললো!

স্বপ্নাবিষ্টের মতো, স্বপ্নে যেভাবে ওর এ কথার জবাব দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবে বললাম, 'তো কি! আমি ঘোড়া হলে তুই তো মাদি ঘোড়াই!'

'দ্যাখ! লজ্জায় আমি কিন্তু লাল-নীল-বেগুনী হয়ে যাচ্ছি! তুই কি থামবি?'

স্বপ্নে উত্তরে যা বলি তাই বললাম, 'না থামবো না। তুই আমাকে ঘোড়া বললি কেন?'

মাহিন এখন কি বলবে আমি জানি। তবু দু'কান ভীষণ সজাগ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

'ঘোড়ার মতো হাঁটলে ঘোড়া বলবো না তো ভেড়া বলবো? সাথে যে একটা মেয়ে আছে সে খেয়াল আছে? বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও উনি ঘোড়ার মতো হেঁটেই যাচ্ছেন! ওনার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে পায়ের নাট-বল্টু খুলে গেছে আমার!'

স্বপ্নে যেভাবে হেসেছিলাম ঠিক সেভাবে হো হো করে হেসে ফেললাম। এভাবে আমাকে হাসতেই হবে। এ যে আমার নিয়তি! আশ্চর্য ভালো এ বদ মেয়েটাকে যেসব কারণে ভালো লাগে তার একটি হচ্ছে প্রবল রসবোধ। হঠাৎ হঠাৎ এমন সব কথা বলে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়।

নিয়তির নির্দেশে হাসতে হাসতে বললাম, 'তুই লেখালেখি করলে অনেক ভালো করতে পারবি।'

চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক তুলে ও বললো, ' পাম্পিং? আমাকে পাম্প দেয়া হচ্ছে, না?'

ও একথা বলার পর ওকে পাশে নিয়ে ফের হাঁটতে শুরু করি স্বপ্নে। তার একটু পরই হঠাৎ লঞ্চের ভেঁপু ভেসে আসে প্রতিবার। লঞ্চের ভেঁপু শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় আমার।

মাহিনকে পাশে নিয়ে ফের হাঁটতে শুরু করেছি। এখন থেকে কি কি হবে, সামনে কি অপেক্ষা করছে সবই আমার অজানা। শুধু জানি, স্বপ্নের মতো এখনই হঠাৎ করে লঞ্চের ভেঁপু ভেসে আসবে না। কারণ, আশপাশে নদীর কোনো অস্তিত্ব নেই। এ মাটির রাস্তাটার দূর, বহু দূরের সেই শেষ মাথায় সেই নদী আছে কিনা কে জানে! তবে আমার মন বলছে আছে। থাকতে বাধ্য। নইলে রহস্যময়ী এ মেয়েটা এ পথ দিয়ে নিয়ে যেতো না আমাকে।

আস্তে আস্তে হাঁটছি। যথাসম্ভব ছোটো ছোটো পদক্ষেপ ফেলছি। আমার ঠ্যাঙ আবার ঘোড়ার ঠ্যাঙের মতো লম্বা লম্বা। তাই মাহিনের সঙ্গে এভাবে তাল মিলিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মেয়েদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কখনোই আস্তে আস্তে হাঁটতে পারি না আমি। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একসময় চমকে উঠে লক্ষ্য করি, সঙ্গের মেয়েটা মাইলখানেক পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকছে! হুম্‌ম্‌... ঘোড়া! ঘোড়ার পদক্ষেপ কতো ফুট কতো ইঞ্চি টেপ দিয়ে মাপতে হবে একদিন; তারপর আমারটা। তাহলেই বোঝা যাবে সত্যিই আমি ঘোড়া হন্টন করি কিনা।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় একটা গঞ্জের পাশে পৌঁছে যাই আমরা। গঞ্জের পাশ দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। গঞ্জের প্রবেশমুখে দাঁড়ানো বিশাল বট গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে পড়ে মাহিন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'আমি আর পারছি না! দাঁড়া!'

মুচকে হাসছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করতেই ভুরু কুঁচকে ফেলে ও। 'শয়তানের মতো হাসছিস কেন!'

'আমি আর পারছি না– শুনে।'

'মানে!' তারপরই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লাল হয়ে ওঠে ওর মুখ। 'আচ্ছা, তুই কি কোনোদিনও ভালো হবি না!'

'আরে, খারাপের কি করলাম! আমি আর পারছি না! কিসের ডায়ালগ কিসে!'

'পানি খাবি?' কথার মোড় ঘোরায় ও।

'দে।' হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে বোতলটা নিই।

'খবরদার মুখ লাগিয়ে খাবি না!'

মুচকে অর্থপূর্ণ হেসে বোতলের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি খাই। তারপর বাড়িয়ে ধরে বলি, 'নে এবার খেয়ে দ্যাখ– শরবতের মতো মিষ্টি লাগবে পানি।'

মুখ বাঁকায় মাহিন। ঝটকা মেরে বোতলটা নিয়ে মুখ টিপে হাসে।

'তুই এখানে একটু দাঁড়া। ভেতরে গিয়ে একটু চা খেয়ে আসি। তুই তো আবার রাজকন্যা, এসব চা মুখে রোচে না।'

'তাড়াতাড়ি ফিরবি। দেরি হলে কিন্তু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবো!'

গঞ্জের ভেতরে ঢুকে চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরাই। আয়েশ করে টানতে টানতে মাহিনের কাছে ফিরে আসি।

'চল!'

ফোঁস করে ওঠে ও, 'তুই আবারো সিগারেট খাচ্ছিস!'

থতমত খেয়ে যাই। যাহ্ শালা, একটুও মনে ছিলো না! সিগারেটটা শেষ করে ফিরলেই হতো। তো তো করে বলি, 'এটাই শেষ। আজকে আর খাবো না।'

'খা! আরো খা! মর! মুখ থেকে তো চিকামরা গন্ধ বের হয়!'

১০০% নির্ভেজাল অপমান। তবু কিছু না বলে নীরবে সহ্য করলাম। সময়ে পাছায় মেয়েদের লাথিও মুখবুজে সহ্য করতে হয়। বিয়ের আগেই এ মেয়ে এতো হম্বিতম্বি করে। বিয়ের পর কি করবে কে জানে!

ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে অর্ধেক খেয়েই ফেলে দিই সিগারেট। দেখে মুচকে হাসে বদ মেয়েটা। রাগে পিত্তি জ্বলতে থাকে। এভাবে জ্বলতে থাকলে যে কোনো সময় দপ করে আগুন জ্বলে উঠতে পারে পিত্তিতে। কাজেই পিত্তি জ্বলা বন্ধ করতে ওর পিত্তি জ্বলার ব্যবস্থা করা দরকার। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে গা জ্বালানো হাসি হেসে আফসোসের ভঙ্গিতে দু'পাশে মাথা নাড়ি।

'অ্যাই ইবলিশ, কি দেখছিস এভাবে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে ও।

'৬৫ কেজি! আল্লাহ্! আমারও ৬৫! তার মানে ৬৫+৬৫ = ১৩০ কেজি!'

'আমার ৬৫ কেজি তাতে তোর কি সমস্যা হারামজাদা!'

'ঐ যে ১৩০ কেজি? ওটাই সমস্যা।'

'সমস্যা? তাহলে যা, বাতাসী বেগমদের সঙ্গে প্রেম করগে গিয়ে! আমার কাছে আসছিস কেন?'

'প্রবল ভালোবাসার টানে।'

খিলখিল করে হেসে ফেললো মাহিন। 'বদ! পাম্প দিচ্ছে!'

'আরে না, সত্যি বলছি। তোর মতো করে কেউ আমাকে এতো ভালোবাসবে, বল?'

'আচ্ছা!'

'এই যে মোটা বলে খোটা দিই এটাও ভালোবাসার কারণে। একটু স্লিম হলে তোকে আরো সুন্দর লাগতো।'

‘আমি কি করবো!’

‘যাই করিস ভুলেও ব্যায়াম করবি না! খালি খাবি! আইসক্রিম! স্যুপ! বেদানা! খা! মর!’

বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো খিলখিল করে হাসতে থাকে মাহিন। ওর মিষ্টি কণ্ঠের সে হাসি কেমন অপার্থিব শোনায় ঝিম ধরা এই রোদেলা দুপুরে। কেমন অবশ হয়ে যাই আমি সে হাসি শুনে।

ফের হাঁটতে শুরু করেছি আমরা। আর কতো দূর? আর কতো দূরে সে নদী? আর কতো দূরে সে লঞ্চঘাট?

‘এ রাস্তার শেষে সত্যিই সেই নদীটা আছে তো? সেই লঞ্চঘাটও আছে?’ জিজ্ঞেস করি মাহিনকে।

‘অবশ্যই আছে।’

‘তুই কি করে জানিস?’

রহস্যময় হাসে ও। ‘আমি জানি। তোর সব স্বপ্নের ঠিকানা আমার জানা।’

কেন যেন চমকে উঠি। এ মুহূর্তে কেমন অচেনা মনে হয় শত জনমের চেনা এ মেয়েটাকে। আর কিছু না বলে অদ্ভুত মেয়েটার পাশে পাশে হাঁটতে থাকি।

আরো মিনিট পনেরো হাঁটার পর হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আমার। ওই তো দূরে দেখা যায় এক নদী! হু হু করে মাতাল এক হাওয়া ভেসে আসছে নদী থেকে! সাদা গাঙচিলেরা ডানায় রোদের ঝিলিক তুলে উড়ে বেড়াচ্ছে! হঠাৎই লঞ্চের ভেঁপু ভেসে আসে!

ঝট করে মাহিনের দিকে তাকাই। অচেনা এক নারীর মতো রহস্যময়ভাবে হাসছে ও। কিছু বলছে না। ওর ডান হাতটা বাঁ হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরি। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো দ্রুত হাঁটতে শুরু করি।

স্বপ্নের সেই নদীর দিকে!

স্বপ্নের সেই লঞ্চঘাটের দিকে!

For More Books Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com